হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

প্রকাশ ১৯৬০

প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৯

মুদ্রক শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান সংস্করণে হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপে প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণে হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রাচীন ও মধ্য যুগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণে আধুনিক যুগও সংক্ষিপ্ত আকারে যোগ করা হয়েছে; তার মধ্যে বাংলা দেশের বিবরণ কিছু প্রাধান্য পেয়েছে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও কলেবরের সীমাবদ্ধতার বিবেচনায় তথ্যের সন্নিবেশ সীমিত করা হয়েছে।

মুদ্রণ-সম্পর্কিত বিষয়ে শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক বিশেষ আনুকূল্য করেছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস যথাযথভাবে আজও লিখিত হয় নাই। শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁহার 'রাগ ও রূপ' ও 'সংগীত ও সংস্কৃতি' নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় যুগের সংগীতের যে বিপুল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। শ্রদ্ধেয় ডক্টর অমিয়নাথ সান্যাল শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধে যে গবেষণা করিতেছেন তাহার মূল্যও যথেষ্ট। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পরিচালিত শিক্ষক-গঠন বিষয়ে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস একটি প্রয়োজনীয় পাঠ্য বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি বাংলার বহু ছাত্র-ছাত্রী সংগীত-শিক্ষায় যোগদান করিয়াছে। তাহাদের পক্ষে ভারতীয় সংগীতের বিস্তৃত ইতিহাস পাঠ বা গবেষণা বিশেষ কঠিন।

এই সকল তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য সহজপাঠ্য একটি পুস্তক প্রয়োজনীয়। ভারতীয় সংগাতের ইতিহাস তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রাগৈতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় সংগীতের বিবরণ; দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম সংস্কৃতির সংযোগে মার্গসংগীতের বিকাশের পরিচয় ও তৃতায় ভাগে ইংরাজের ভারতে আগমনের পর হইতে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের প্রগতির বর্ণনা থাকা প্রয়োজনীয়। বর্তমান গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় যুগ

হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগ পর্যন্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অবশ্য হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসই বাংলার শিক্ষা বিভাগের প্রধান পাঠ্য। আমরা কর্ণাটিক সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই। বাংলার প্রাদেশিক সংগীতের বিবরণ ছাত্র-ছাত্রীগণ অন্যান্য গ্রন্থে যথেষ্টই পাইবেন।

'হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস'এর প্রথম ভাগ যাহা এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সব কথাই লিখিত হইয়াছে। আমার লিখিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাসকল গুছাইয়া এই গ্রন্থপ্রকাশে বিশেষভাবে আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া কুমারী অরুণা বাগচী বি. এ. বি. টি., বি. মিউজ. সংগীত-বিশারদ এবং বিজয়া চট্টোপাধ্যায় বাদ্যবিশারদ বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং আমার গুরুভ্রাতা জনাব সৌকত আলী খান (সেনী) সাহেব এই গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী রহিলাম। এক্ষণে বঙ্গীয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এই গ্রন্থপাঠে যদি একটু উপকার বোধ করেন তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে বলিয়া মনে হয়।

৭ মে ১৯৬০

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

সূচীপত্র

অবতারণা ১

প্রাচীন যুগ

প্রাক্-বৈদিক যুগ ১

বৈদিক যুগ ২

পৌরাণিক যুগ ৮

বৌদ্ধ যুগ ৯

নারদ ৯

ভরত ১০

মতঙ্গ ১৩

পার্শ্বদেব ১৫

নারদ (দ্বিতীয়) ১৫

মধ্য যুগ

জয়দেব ১৭

শার্ঙ্গদেব ১৮

আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকাল

আমীর খসরু ২২

নায়ক গোপাল ২৪

বৈজু বাওরা ২৫

কবি লোচন ২৬

কল্লিনাথ ২৭

সুলতান হুসেন শর্কী ২৭

রাজা মান ও রানী মৃগনয়নী ২৮
কবীর ২৯
মীরাবাঈ ৩০
বাবা রামদাস ও সাধক সুরদাস ৩১
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৩২
মহাকবি তুলসীদাস ৩৩
স্বামী হরিদাস ৩৩
শাহানশা আকবরের রাজত্বকাল
তানসেন ৩৫
পুণ্ডরীক বিট্ঠল ৪২
নায়ক বৈজু ৪৩
বিলাস খাঁ ৪৩
নবাৎ খাঁ (মিশ্রি সিং) ৪৫
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল
সোমনাথ ৪৭
পণ্ডিত দামোদর মিশ্র ৪৭
শাহ্জাহানের রাজত্বকাল
পণ্ডিত অহোবল ৪৮
ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ৪৯
পণ্ডিত ব্যঙ্কটমোখী ৪৯
পণ্ডিত ভাবভট্ট ৫০
মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল
নিয়ামৎ খাঁ (শাহ্ সদারঙ্গ) ৫০
অদারঙ্গ ৫৩

মধ্যযুগের সংগীতজ্ঞগণের শ্রেণীভেদ — ৫৩
আধুনিক যুগ
তানসেনের পুত্রবংশলতিকা — ৫৭
তানসেনের কন্যাবংশলতিকা — ৫৮
জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ — ৬০
বাসৎ খাঁ — ৬১
উজ্রীর খাঁ — ৬৩
ওয়াজেদ আলি শা — ৬৮
রামশঙ্কর ভট্টাচার্য — ৬৯
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী — ৭০
অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় — ৭১
যত্নাথ ভট্টাচার্য (যত্ন ভট্ট) — ৭২
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী — ৭৩
রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর — ৭৪
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় — ৭৫
পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে — ৭৬
পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর — ৭৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৭৯
নির্ঘণ্ট — ৮৯

অবতারণা

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে— প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগ বলতে প্রাক্-বৈদিক এবং বৈদিকোত্তর যুগ বোঝায়। এই যুগের ব্যাপ্তি আনুমানিক খৃস্ট-পূর্ব ৪০০০ বৎসর থেকে খৃস্টীয় ১০০০ বৎসর পর্যন্ত। মধ্য যুগের ব্যাপ্তি ১১০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগে সংগীতে মুস্‌লীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তার পরবর্তী সময়কে বলা হয় আধুনিক যুগ।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের ঠিক কবে যে সূত্রপাত হয়েছিল তৎসম্বন্ধে মতান্তর আছে। লিপির অভাব ও দুর্বোধ্যতা, মুদ্রাযন্ত্র ও গ্রন্থের অভাব স্বল্পতা ও দুষ্প্রাপ্যতা, দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তি ইত্যাদি বহুবিধ কারণে ইতিহাসের সূচনা নিরূপণ করাও দুষ্কর। সে-সব সত্ত্বেও অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যে মত গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন বর্তমান গ্রন্থে তদনুসারী মতই লিপিবদ্ধ হল।

প্রাক্-বৈদিক যুগ

৪০০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ – ২৫০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ

প্রাক্-বৈদিক যুগে সংগীতের অস্তিত্ব সিন্ধু-সভ্যতা থেকে অনুমান করা যায়। স্যর জন মার্শালের মতে সিন্ধু-সভ্যতার কাল আনুমানিক ৫০০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৩০০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত। মহেঞ্জোদড়ো ও হরাপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে

জানতে পারা যায় যে সে যুগেও নিয়মবদ্ধ সংগীতের প্রচলন ছিল। এমন-কি সাত স্বরের ব্যবহারও যে সে যুগে ছিল তার প্রমাণ ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত সাত ছিদ্রযুক্ত বাঁশি। তা ছাড়া, বর্তমান যুগের রবাব ও স্বরোদের মতো তন্ত্রীযুক্ত কয়েকটি বীণা, মৃদঙ্গাদি চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, খঞ্জনী বা করতাল এবং ব্রোঞ্জ-নির্মিত নৃত্যশীলা নারী ও নর্তকের মূর্তি নিঃসন্দেহে গীত-বাদ্য-নৃত্যের প্রচলন প্রমাণ করে। আর শিবমূর্তি দেখে মনে হয়, দ্রাবিড় সভ্যতায় শিবপূজার রীতি ছিল। পরবর্তীকালে শিবকে গুরুরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা।

বৈদিক যুগ

আনুমানিক ২৫০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ – ১০০০ খৃস্টাব্দ

সিন্ধু-সভ্যতার প্রামাণিক কাল এখনও নির্ধারিত হয় নি। বৈদিক সভ্যতা তার আগে বা পরে তাও ঠিকভাবে জানা যায় নি। সেজন্যই বেদের যথার্থ কাল নির্ণয় করা খুবই কঠিন। অনেকে বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করেছেন ১০০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ। জর্মান পণ্ডিত ম্যাক্‌স্‌মূলারের মতে বেদের কাল ১২০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ; আবার ডক্টর উইন্‌টারনিজের মতে খৃস্ট-জন্মের ২৫০০ বৎসর পূর্বে। শ্রদ্ধেয় বালগঙ্গাধর তিলক বলেছেন, বৈদিক সভ্যতার কাল ৫০০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ। অধ্যাপক হার্মান জেকবের মতে বেদের বয়স ৬৫০০

বৎসর। ডক্টর বুলার পূর্বোক্ত দুজনের মত কিছুটা সমর্থন করেছেন।

উল্লিখিত বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করে ৪০০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বৈদিক যুগ বলা যায়। এই সময়েই ভারতীয় সংগীতের রূপকে অল্পবিস্তর স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আরম্ভ ঋক বেদ থেকে। ঋক বেদে বিভিন্ন ঋক-ছন্দের মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। দেবতাদের তুষ্টির জন্য এই মন্ত্রগুলিতে সুরসংযোগ করে সামগ ঋষিরা গান করতেন। এ ভাবেই সাম বেদের সৃষ্টি হয়। আচার্য সায়ন বলেছেন : গীতিরূপা মন্ত্রঃ সামানি। এই **সাম বেদই** ভারতীয় সংগীতের মূলাধার। 'ঋক প্রতিশাখ্য' বৈদিক সংগীত সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। **সামগান** সাধারণত যাগযজ্ঞ বা কোনো আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে গাওয়া হত। এই সাম বেদ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত— আর্চিক ও স্তৌভিক। আবার আর্চিকের তিন ভাগ— পূর্বার্চিক, অরণ্য সংহিতা ও উত্তরার্চিক। পূর্বার্চিক হল মূল গানের সমষ্টি ; তার মধ্যে গ্রামে-গেয় গান, অরণ্যে-গেয় গান, উহ ও উহ্য এই চারটি ভাগ আছে। উত্তরার্চিকের গানগুলিকে প্রগাথ বলা হত। পূর্বার্চিকে অরণ্যে-গেয় গানগুলি ছিল অরণ্যবাসী ঋত্বিক ও সামগদের জন্যে। গ্রামে-গেয় গানগুলি গৃহবাসীদের জন্যে নির্ধারিত ছিল। এই গ্রামে-গেয় গান থেকে বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ, মার্গ থেকে উদ্ভূত দেশী,

এবং তা থেকে বর্তমান ক্ল্যাসিকাল গানের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়।

যে সামগান গাওয়া হত তার ছিল দুই রূপ—আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক। আভ্যুদয়িক অর্থে যে সামগান যাগযজ্ঞ পূজা-অর্চনা প্রভৃতিতে গাওয়া হত। আভিচারিক গানের ব্যবহার হত সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। এই গানের প্রভাবে মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতির সাহায্যে মনস্কামনা সিদ্ধ করা হত। পরবর্তীকালে আভিচারিক সংগীত সাধারণের কাছে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। সম্ভবত এই সংগীতের অপব্যবহার ও কুফল দেখেই প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল। আভিচারিক সংগীতের রূপ বা পদ্ধতি যে কিরূপ ছিল আজ আর তা জানবার কোনোই উপায় নেই। তবে উত্তর-বৈদিক যুগেও এই সংগীতের ধারা যে অতি গোপনে প্রবাহিত ছিল তার প্রমাণ মাঝে মাঝে শাস্ত্রে বা কাব্যে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এই সংগীতকে রহস্যসংগীতও বলা হত। এর সঙ্গে গান্ধার গ্রামের একটা নিবিড় সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। প্রাচীন সংগীতের ষড়্‌জ গ্রাম বা মধ্যম গ্রাম সম্বন্ধে যেমন জানা যায় গান্ধার গ্রাম সম্বন্ধে সেভাবে কিছুই জানা যায় না। হয়তো এই গান্ধার গ্রামের স্বরবিন্যাসই আভিচারিক সংগীতের উৎস ছিল।

আভিচারিক এবং আভ্যুদয়িক উভয় সংগীতই বৈদিক সংগীতের অন্তর্গত। বৈদিক যুগে এক স্বর থেকে সাত স্বরের ক্রমবিকাশের স্তর দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, আর্চিকে একটি

স্বরের, গাথিকে দুই স্বরের, সামিকে তিন স্বরের, স্বরান্তরে চার স্বরের, ওড়বে পাঁচ স্বরের, ষাড়বে ছয় স্বরের ও সম্পূর্ণে সাত স্বরের বিকাশ দেখা যায়। শেষের তিনটির প্রচলন বর্তমান যুগের ভারতীয় সংগীতেও আছে। সাধারণত সামিক যুগ অর্থাৎ তিনটি স্বরের যুগ থেকে সম্পূর্ণ যুগের বিকাশে সংগীতের একটি পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন স্বরের বিকাশ থেকে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না যে বৈদিক যুগে সংগীতে তিন স্বর থেকে সাত স্বর ব্যবহার করা হত। বৈদিক সাহিত্য, শিক্ষা ও প্রতিশাখ্য থেকে বৈদিক সংগীত সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। 'ঋক প্রতিশাখ্য' বৈদিক সংগীত সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক ৩০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ, রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে ঔদব্রজি, আবার মতান্তরে সৌনক-কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ঋক বেদের যুগে উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত, কণ্ঠস্বরের এই তিনটি ভাগ করা হত। এই তিন শ্রেণীর স্বর থেকে যথাক্রমে তারা উদারা ও মুদারা এই 'ত্রি' স্থানের ধারণা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকের মতে মা গা রে— উদাত্ত, সা— অনুদাত্ত এবং নি ধা পা —স্বরিত। স্বরের বৈদিক পরিভাষা ছিল যম। বেদগান প্রায়শই তিনটি বা চারটি স্বরে গাওয়া হত। বৈদিক সাত যমের নাম ছিল— প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ক্রুষ্ট মন্দ্র ও অতিস্বর। বৈদিক মন্দ্র মা গা রে সা নি ধা পা এই অবরোহ গতিতে সাত স্বরে

গাওয়া হত।

তৎকালে লয়-নির্ধারণের জন্য মাত্রার প্রচলন ছিল। মাত্রা-ভাগ অনুযায়ী হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন বিভাগ দেখা যায়। এক মাত্রা স্থায়ী স্বরকে হ্রস্ব, দু মাত্রা স্থায়ী স্বরকে দীর্ঘ, আর তিন মাত্রা স্থায়ী স্বরকে প্লুত বলা হত। তা ছাড়া, গায়ত্রী উষিভ্‌ক অনুষ্টুপ বৃহতী পংক্তি ভাগতী ও নিষ্টুপ এই সাতটি ছন্দ ব্যবহৃত হত।

সামগান যখন গাওয়া হত তখন তাকে সাতটি ভাগে ভাগ করে গাওয়া হত। গানের প্রথমেই হুংকার দেওয়া হত অর্থাৎ, 'হুং' শব্দ ব্যবহার করা হত। গানের শেষে থাকত প্রণব বা ওংকার।

'ঋক প্রতিশাখ্যে'র পরবর্তী সংগীত-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হিসাবে 'পাণিনিশিক্ষা'র নাম করা যায়। পাণিনির আবির্ভাবকাল খৃস্ট-পূর্ব ৩৫০ অব্দ। পাণিনি বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য করেছেন। তিনি বলেছেন, উত্তরাঙ্গে নি উদাত্ত, ধা অনুদাত্ত, পা স্বরিত এবং পূর্বাঙ্গে গা উদাত্ত, রে অনুদাত্ত, সা স্বরিত। 'পাণিনিশিক্ষা'য় শিবমতের নাম পাওয়া যায়। স্যর উইলিয়ম হাণ্টার 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া'য় লিখেছেন যে ভারতীয় সংগীতের স্বর ও স্বরলিপি পাণিনির সময় থেকেই প্রচলিত ছিল। সংগীতে ব্যবহৃত স্বরগুলির নাম ছিল সা রে গা মা পা ধা নি।

'পাণিনিশিক্ষা'র পর সামবেদের নানা শিক্ষা-গ্রন্থে সংগীত

বিষয়ের আলোচনা আছে। সাম বেদে স্বর ও ছন্দে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। সামগান যাঁরা গাইতেন তাঁদের উদ্গাতা বলা হত। গানের সঙ্গে বীণা মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাদ্য ও নৃত্যের সহযোগ থাকত।

বৈদিক যুগে বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে-সব যন্ত্রের নির্মাণ-প্রণালীও লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিক সাহিত্যে বীণা ও বেণু এই দুটি যন্ত্রের উল্লেখ প্রাচীনতম। চামড়ার বাদ্য-যন্ত্র হিসাবে দুন্দুভি ভূমিদুন্দুভি ইত্যাদির উল্লেখ বহু প্রাচীন। তা ছাড়া, ঋক বেদে গর্গর, পিঙ্গ বা ধনুযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। পিঙ্গ বা ধনুযন্ত্র নীলাভ তাম্রবর্ণের তন্ত্র বা নাড়ি দিয়ে তৈরি করা হত। অনেকের মতে এই পিঙ্গ যন্ত্রটিই পরে বাহুলীন বা বেহালা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। উপরন্তু বৈদিক যুগে কর্করী আঘাটী ঘাতলিকা কাণ্ডবীণা নাড়ী বনস্পতি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য সকল যন্ত্রের মধ্যে বীণাই ছিল প্রধান। সে যুগে নানা নামে বহুপ্রকারের বীণা প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, ঔদম্বরী বীণা, পিচ্ছলা বা পিচ্ছোড়া বীণা, শততন্ত্রী বীণা, কাত্যায়নী বীণা, গোধা বীণা ইত্যাদি।

পৌরাণিক যুগ

খৃস্ট-পূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে ৫০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কে পৌরাণিক যুগ বলা হয়। এই যুগের সংগীত সম্বন্ধে খুব বিশদভাবে জানা না গেলেও 'পাণিনিশিক্ষা' ও 'পাতঞ্জলসূত্র' গ্রন্থে সংগীতের প্রচলন -সম্পর্কিত উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় মহাকাব্য দুটিতেও সংগীতের উল্লেখ আছে। মহাভারতে, উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যে বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তা ছাড়া, মহাভারতে সাত স্বর (যম নয়) শ্রুতি মূর্ছনা, ষড়্‌জ মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রাম ও রাগের নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে, লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশকালে বীণাবাদনে উদ্ভূত সুর শুনেছিলেন। সর্বোপরি লব-কুশের রামায়ণ গানকে রীতিমত রাগসংগীত বলা যায়। লব-কুশের গান শুনে স-সভাসদ রামচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মনেও আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল—হ্লাদায়ৎ সর্বগাত্রানি মনাংসি হৃদয়ানি চ। কাজেই সন্দেহ থাকে না যে সভায় লব-কুশ রাগসংগীতই পরিবেশন করেছিলেন।

পৌরাণিক যুগে শিবকে সকল শিল্পকলার গুরুরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেবাদিদেব শিব বাণী তথা ভাষার জনয়িতা রূপেও কল্পিত। যথা—

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥

অর্থাৎ, নটরাজ শিব স্বীয় নৃত্য সমাপ্ত করার পর সনকাদি সিদ্ধগণের উদ্ধার-কামনায় বাক্যাদির অগোচর-রূপের পরমতত্ত্ব ব্যক্ত করার জন্যে চৌদ্দ বার ডমরুধ্বনি করলেন। তার ফলে বাণীর মূলাধার চৌদ্দ সূত্রের উৎপত্তি হল। এই চৌদ্দটি সূত্রে (বাণী তথা ভাষার) গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। বর্তমান যুগের উচ্চাঙ্গ সংগীতকে সে-যুগে গন্ধর্ব-বিদ্যা বলা হত। দেবী সরস্বতী সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পিত। এই যুগে অপ্সরাদের নৃত্য এবং কিন্নর ও গন্ধর্বদের গীতবাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ যুগ

খৃস্ট-পূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে বৌদ্ধ যুগের কাল নির্ণয় করা হয়। বৌদ্ধ যুগের সংগীত-গ্রন্থের মধ্যে 'শিল্পাদিকরম্' গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যদিও এটি নাট্যগ্রন্থ তবু এতে স্বর শ্রুতি গ্রামরাগ মূর্ছনা প্রভৃতির পরিচয় পৌরাণিক যুগের গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির রচনাকাল খৃস্ট-পূর্ব ২০০ অব্দ বলে অনুমিত হয়।

নারদ

বৌদ্ধ যুগের শেষে সম্ভবত খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নারদ নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি 'নারদীয় শিক্ষা' নামে সংগীত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে সামগানের রীতি সম্বন্ধে

যথেষ্ট বর্ণনা আছে। তাতে সপ্তস্বর এবং তাদের উদাত্ত অনুদাত্ত ইত্যাদি স্থানভেদ, একুশ মূর্ছনা, বাইশ শ্রুতি, তিন গ্রাম এবং রাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বৈদিক ও লৌকিক দু রকম গানেরই আভাস আছে। উক্ত নারদই সর্বপ্রথম বৈদিক স্বরের সঙ্গে লৌকিক স্বরের একটি সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সামগানের প্রথম স্বরের সঙ্গে উচ্চারণগত বা ধ্বনিগত ঐক্য আছে লৌকিকের মধ্যম স্বরের, দ্বিতীয় স্বরের সঙ্গে গান্ধারের, তৃতীয় স্বরের সঙ্গে ঋষভের ও চতুর্থ স্বরের সঙ্গে ষড়্জের। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সামগানের সুরের গতি বর্তমান যুগের সাংগীতিক পরিভাষায় ছিল নিম্নগতি। 'নারদীয় শিক্ষা'য় জাতি-রাগের কোনো পরিচয় মেলে না। তবে গ্রাম-রাগের উল্লেখ আছে, যথা—ষড়্জ পঞ্চম কৌশিক মধ্যম ষাড়ব ইত্যাদি। মনে রাখা আবশ্যক যে বীণাবাদনপূর্বক হরিগুণগানে রত দেবর্ষি নারদ ও 'নারদীয় শিক্ষা' গ্রন্থপ্রণেতা নারদ ভিন্ন ব্যক্তি। তা ছাড়াও বিভিন্ন নারদের পরিচয় সংগীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ভরত

ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে ভরত-কৃত **নাট্যশাস্ত্র** বিশেষ নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ। রচনাকাল সম্পর্কে মতান্তর থাকলেও অধিকাংশ পণ্ডিতগণ মনে করেন এই গ্রন্থ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু প্রধানত নাট্য-সম্পর্কিত। এই গ্রন্থের মোট ছত্রিশটি অধ্যায়ের মধ্যে ত্রিশটি

অধ্যায় নাট্য সম্বন্ধে ও ছয়টি সংগীত সম্বন্ধে বিরচিত। সংগীতের ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে ২৮ ও ২৯ -সংখ্যক যে দুটি অধ্যায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তার বিষয়বস্তুর সমাবেশ নিম্নরূপ :

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

আতোদ্যবিধিঃ॥ বাদ্যের চার ভেদ—লক্ষণ ও বিবিধ প্রয়োগ, স্বরগত বিধি, তালগত বিধি, স্বর-শ্রুতি-গ্রাম, দুই গ্রামের চৌদ্দ মূর্ছনা, চুরাশি মূর্ছনা-তান, সাধারণ বিধি, স্বর-সাধারণ; জাতি-সাধারণ—জাতি, শুদ্ধ ও বিকৃত আঠারো জাতি, তাদের গ্রহ অংশ ন্যাস ইত্যাদির বিবরণ।

একোনত্রিংশ অধ্যায়

ততাতোদ্যবিধাবনম্॥ রস অনুযায়ী জাতিসমূহের প্রয়োগ, বাদ্য প্রয়োগ, স্বর-বর্ণ-অলংকার, গীতালংকার বিধি, বর্ণবিহীন অলংকার, চার ধাতু, তিন বৃত্তি, উত্তম বাদ্যের লক্ষণ, বিবিধ বীণাজাতীয় বাদ্য, ভিন্ন প্রকারের বীণা ও তাদের বাদন-পদ্ধতি।

নাট্যশাস্ত্রে সংগীতের যে সকল তত্ত্ব ও উপাদান আছে তা অবলম্বন করেই পরবর্তীকালের রাগসংগীতের ক্রমবিকাশ হয়েছে। ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি ও স্বর-তত্ত্ব অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, নির্ভুলতা ও প্রামাণিকতার গুণে ভরতের শ্রুতি ও স্বর -তত্ত্ব অবিসম্বাদিত।

নাট্যশাস্ত্রকার জাতি বা জাতি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যশাস্ত্রে আঠারোটি জাতি উল্লিখিত। এই জাতিগুলি রাগ কি না তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। অনেকে

এগুলিকে রাগ হিসেবে স্বীকার করতে চান না। কিন্তু জাতির যে দশবিধ লক্ষণ বর্ণ অলংকার ধাতু প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া আছে তা থেকে এগুলি রাগ বলেই প্রমাণিত হয়। ভরতের আঠারোটি জাতি-রাগের মধ্যে সাতটি ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের অন্তর্গত। ষড়্জ গ্রামের মধ্যে ধৈবতী, আষভি, নিষাদী, ষড়্জ, কৌশিকী, ষড়্জ্যোদির্চব্যতী, ষাড়্জী ও ষড়্জ-মধ্যমা জাতি-রাগগুলি পড়ে। মধ্যমদিচ্যবা, কর্মারবি, অন্ধ্রি, মধ্যমা, গান্ধারী, রক্তগান্ধারী, কৌশিকী প্রভৃতি জাতি-রাগগুলি মধ্যম গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভরতের পুত্র ও শিষ্য দত্তিল এই জাতি-রাগগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। দত্তিল-কৃত 'দত্তিলম্' অপূর্ণ গ্রন্থ, সম্পূর্ণ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। 'দত্তিলম্' সংগীত-সম্পর্কিত গ্রন্থ, নাট্যবিষয় তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ভরত বাদ্যযন্ত্রের চারটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন :

১. তত বা তারের বাদ্যযন্ত্র। বীণা ইত্যাদি।

২. অনবদ্ধ বা আনদ্ধ। চপেটাঘাতের দ্বারা বাদিত মৃদঙ্গ-জাতীয় যন্ত্র।

৩. বৈন। ফুৎকার সাহায্যে বাদিত বেণুজাতীয় যন্ত্র।

৪. ঘন। কাংসজাতীয় ধাতুময় বাদ্যযন্ত্র।

এই-সব বাদ্যযন্ত্রে কী ভাবে সুরসংযোগ করতে হয় এই গ্রন্থে তার বিশদ বিবরণ আছে। এমন-কি তাদের নির্মাণ-প্রণালীও লিপিবদ্ধ আছে। ভরত দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত লয় সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। লয়-সমন্বিত বহুবিধ তালেরও পরিচয়

দিয়েছেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নাট্যশাস্ত্র প্রধানত নাট্য-সম্পর্কিত। বস্তুত এই মূল্যবান গ্রন্থে প্রেক্ষাগৃহ, অভিনয়কলা, নৃত্যশৈলী, রসতত্ত্ব, ভাবব্যঞ্জনা, নাট্যকাব্যের দোষগুণ, নাট্যের পাত্র-পাত্রীর বিচার, নাট্যের ভাষাবিধান ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের যে অবতারণা, বর্ণনা ও বিচার-বিশ্লেষণ আছে তা দ্বারা নাট্যশাস্ত্রকারের পাণ্ডিত্য, উপলব্ধি ও বহু দূরদর্শিতার প্রমাণ হয়। প্রকৃতপক্ষে, নাট্যশাস্ত্রকার ভারতীয় সংগীতের অতুলনীয় দিক্‌দশনকারী ব্যক্তি।

মতঙ্গ

নাট্যশাস্ত্রের যুগ থেকে অর্থাৎ অধিকাংশের মতে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই দেশীসংগীতকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পর্যায়ভুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়। নাট্যশাস্ত্রে মগধ দেশীয় মাগধী রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রীতির পূর্ণ পরিণতির পরিচয় খৃস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে রচিত মতঙ্গ-কৃত **বৃহদ্দেশী** গ্রন্থে পাওয়া যায়। নাম থেকেই বোঝা যায় যে দেশীয় রাগ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। বৃহদ্দেশীতে বহু দেশী বা আঞ্চলিক সুরকে জাতি ও গ্রামরাগের ভিত্তিতে সংস্কৃত করে তাদের মার্গশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই দেশী রাগগুলি ভাষা-রাগ বা অঙ্গ-রাগ নামে পরিচিত। দেশী সুরগুলিতে তিনটি বা চারটি স্বর ব্যবহৃত হত। তার সঙ্গে

আরো দু-তিনটি স্বর যোগ করে সেগুলিকে মতঙ্গ মার্গশ্রেণী-ভুক্ত করেছেন। কারণ পাঁচ স্বরের কমে রাগ গঠিত হয় না। বৃহদ্দেশীতে ছিয়াত্তরটি রাগের নাম পাওয়া যায়— ঠক্ক, বোট্ট, সৌবীর, গুর্জরী, সৌন্ধবী, গান্ধারী, দ্রাবিড়ী ইত্যাদি। স্বর ও রাগ বিষয়ে মতঙ্গ ভরতের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। বৃহদ্দেশীতে ষাষ্ঠিক নামে একজন গ্রন্থকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষাষ্ঠিকের কোনো গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। ষাষ্ঠিকের মতে আঠারোটির পরিবর্তে সাতটি জাতির উল্লেখ আছে, যথা— শুদ্ধা, ভিন্না, গৌরী, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা। তন্মধ্যে শুদ্ধা আটটি, ভিন্না আটটি, গৌরী তিনটি, রাগগীতি আটটি, সাধারণী সাতটি, ভাষা ষোলোটি ও বিভাষা বারোটি, মোট বাষট্টিটি রাগের নাম আছে। ষাষ্ঠিকের এই মতের কতকটা মতঙ্গ গ্রহণ করেছেন। মতঙ্গ আঠারোটি জাতি থেকে গ্রাম-রাগের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন। শ্রুতি, ন্যাস, স্বর ইত্যাদি থেকেই জাতির সৃষ্টি হয়। শুদ্ধা, ভিন্না, গৌরী, বেসরা ও সাধারণী এই পাঁচ প্রকার রীতিতে এই জাতি ও গ্রাম-রাগ গাওয়া হত। গ্রামের অন্য নাম ছিল মার্গ। আবার গ্রামকে ভাষাও বলা হত। তা থেকে অন্যান্য উপরাগ বা বিভাষা ও অন্তর্ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্রন্থেই রাগ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছে।

পার্শ্বদেব

মতঙ্গের প্রায় সমসাময়িক পার্শ্বদেব নামক গ্রন্থকার 'সংগীত সময়সার' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রধানত অঙ্গরাগের বিবরণ আছে, এবং এমন অনেক রাগের নাম পাওয়া যায় যে-সব নামের রাগ আজও প্রচলিত আছে— যেমন, ভৈরব ভৈরবী ইত্যাদি, যদিও তখনকার সে-সব রাগের সহিত বর্তমানের রাগের রূপের কোনো মিল নেই। আলপ্তি বা আলাপের বিবরণ সর্বপ্রথম এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

নারদ (দ্বিতীয়)

'সংগীতমকরন্দ' নামক গ্রন্থটি নারদ-কর্তৃক বিরচিত। এই গ্রন্থের রচয়িতাকে ঐতিহাসিকগণ দ্বিতীয় নারদ নামে অভিহিত করেন। 'সংগীতমকরন্দে'ও আলপ্তির বিবরণ পাওয়া যায়। এই আলপ্তি বা আলাপ থেকেই পরবর্তী যুগে রাগরাগিণী সৃষ্ট হয়েছে। উক্ত দ্বিতীয় নারদই সর্বপ্রথম স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে রাগরাগিণীর নামকরণ করেন। এ সময়ে থাট নামক প্রকরণ ছিল কি না সে-বিষয়ে খুবই মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেন, কাফি থাটের মতো একটি থাট তখন প্রচলিত ছিল। তবে থাটের অস্তিত্ব তৎকালে না থাকাই স্বাভাবিক।

এই সময়ে বিশেষভাবে বা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আভিচারিক সংগীত সম্বন্ধে বলা হয়েছে শান্তি পুষ্টি অভিচারাদি

কর্মে ঔড়ব জাতীয় রাগগুলি প্রশস্ত। বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র তৈরি করার বিবরণ থেকে এ যুগে ছত্রিশ রকম বীণার নাম পাওয়া যায়। তা ছাড়া মৃদঙ্গ ও বেণুর নামেরও সন্ধান মেলে।

'সংগীতমকরন্দ' গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল; আবার কারো মতে উক্ত গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী। যতদূর জানা যায় 'সংগীত-মকরন্দ' ও 'সংগীতসময়সার' এই দু খানি গ্রন্থই রচিত হয়েছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণে।

মধ্যযুগ

১১০০ খৃস্টাব্দ - ১৮০০ খৃস্টাব্দ

মুসলমানগণ একাদশ শতাব্দীতে ভারতে আসেন। সেই সময় থেকেই ভারতীয় সংগীতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রসকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকায় মুসলমানগণের পক্ষে তার মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সংগীতের প্রতি তাঁরা তেমন আগ্রহশীলও ছিলেন না। তবে তাঁদের স্বাভাবিক ক্রিয়াত্মক সংগীতপ্রীতির জন্যে তৎকালে ভারতীয় সংগীতের ক্রিয়াত্মক দিকের উন্নতি হয়েছিল। এই সময়েই ভারতীয় সংগীতে পারসিক সংগীতের প্রভাব পড়ে। অনেক নতুন রাগ নতুন ধরণের গান ও নতুন নতুন তালের সৃষ্টি হয় এবং ভারতীয় সংগীত বৈচিত্র্যময় ওয়ে ওঠে।

জয়দেব

উত্তর ভারত যখন মুসলমান আক্রমণে পর্যুদস্ত তখন, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, বাংলা দেশের নিভৃত কেন্দুবিল্ব গ্রামে কবি **জয়দেব** তাঁর মূল্যবান সংগীত-গ্রন্থ **গীতগোবিন্দ** রচনা করেন। 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্বন্ধে প্রবন্ধগীত সম্বলিত রচনা। এই গ্রন্থখানি সাহিত্যসম্পদেও বিশেষ মূল্যবান। সার এডেন আর্নল্ড The Indian Song of Songs নামে তার ইংরেজি অনুবাদ করেন।

জয়দেব নিজে সংগীতজ্ঞ ও কবি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী। অতি অল্প বয়সে জয়দেব উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগ করেন। পরে পদ্মাদেবীকে বিবাহ করে গৃহী হন। শোনা যায়, জয়দেবের ধর্মপত্নী পদ্মাদেবী খুব উচ্চস্তরের গায়িকা ছিলেন। জয়দেবের সংগীতপ্রতিভা সম্পর্কে অনেক গল্প আজও লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। আর্যা-বর্তের প্রথম বাঙালী গায়ক ও সংগীতরচয়িতা হিসাবে জয়দেবের নাম সংগীতের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

কবি জয়দেবের অমর গ্রন্থ 'গীতগোবিন্দে'র সাংগীতিক মূল্য বড়ো কম নয়। জয়দেবের পদে মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরী, দেশাগ, দেশবরাড়ী, গোণ্ডকিরী, ভৈরবী ইত্যাদি রাগের প্রয়োগ হয়েছে। আর সে সকল পদে রূপক, নিঃসার, যতি, একতালাদি তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও এই রাগগুলি নিয়মবদ্ধ বা ব্যবস্থিতরূপে নেই, তবু পূর্ববর্তী নাথগীতিকা বা মঙ্গলগানের পর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' যে এ দেশের সংগীতে অভিনবত্ব এনেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

শার্ঙ্গদেব

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রগুলিকে একত্র সংগ্রহ করে যিনি সুসংস্কৃত সংগীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করেন তিনি হলেন দাক্ষিণাত্যের শার্ঙ্গদেব। ইনি ত্রয়োদশ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শার্ঙ্গদেব দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্ত এই উভয় দেশের

সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন। কর্ণাট দেশের অন্তর্গত দেবগিরি রাজ্যের রাজসভায় তিনি প্রধান সংগীতকার হিসাবে সম্মানিত হন।

শার্ঙ্গদেব-কর্তৃক রচিত উল্লিখিত গ্রন্থটি হল **সংগীতরত্নাকর**। 'সংগীতরত্নাকর' সংগীতের একখানি মূল্যবান আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সাতটি অধ্যায় আছে— স্বরাধ্যায়, রাগবিবেকাধ্যায়, প্রকীর্ণকাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, তালাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায় ও নর্তনাধ্যায়। তার মধ্যে প্রথম স্বরাধ্যায়টি বিস্তারিত আটটি প্রকরণে বিন্যস্ত, যথা— পদার্থসংগ্রহ প্রকরণ, পিণ্ডোৎপত্তি প্রকরণ, নাদ-স্থান-শ্রুতি-স্বর-জাতি-কুল-দৈবত-ঋষি-ছন্দ-রস প্রকরণ, জাতি প্রকরণ গ্রাম-মূর্ছনা-ক্রমতান প্রকরণ, সাধারণ প্রকরণ, বর্ণালংকার প্রকরণ, জাতি প্রকরণ ও গীতি প্রকরণ। সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে সংগীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নাদ, স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, জাতি ইত্যাদির বিশদ বিবরণও পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রুতির মাননির্ণয় বিষয়ে শার্ঙ্গদেব অপেক্ষা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মত অধিকতর প্রামাণিক ও বিজ্ঞানসম্মত। অনেক বিষয়ে মতঙ্গের সঙ্গে শার্ঙ্গদেবের মতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ভারতীয় সংগীতে বিদেশী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তুরস্কের তোড়ী রাগ, সিথিয়ান রাগ সক, পারস্যের ইমন সাজগিরি জিল্‌হা, কান্দাহার বা গান্ধার দেশ থেকে গান্ধারী, ভূপাল থেকে ভূপ বা ভুপালী, মালব থেকে

মালব ও মালবী, কলিঙ্গ থেকে কলিঙ্গড়া, সিন্ধু থেকে সৈন্ধবী, কম্বোজ থেকে কম্বোজ বা খাম্বাজ, গুর্জর থেকে গুর্জরী, কর্ণাট থেকে কর্ণাট বা কানাড়া, সৌরাষ্ট্র থেকে সৌরাষ্ট্রী বা সুরট, ইত্যাদি দেশী-বিদেশী রাগের উল্লেখ ও পরিচয় 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাগের পরিচয় তাদের ভাবরূপ ও রসরূপ এবং বর্তমান যুগে প্রচলিত বহু রাগের মৌলিক বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তা ছাড়া রহস্য সংগীতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মূর্ছনা ও তান প্রকরণে একটি বিশেষ তানের নাম ও রূপ সংকেতের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। মনে হয় ওই বিশেষ তানটি গান্ধার গ্রামে নির্দিষ্ট ছিল। 'সংগীতরত্নাকরে'র পর আর কোনো গ্রন্থে আভিচারিক সংগীতের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রাগের বিবরণ দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন রাগের সংখ্যা ২৬৪। তার মধ্যে গ্রাম-রাগ ত্রিশটি, উপরাগ আটটি, রাগ কুড়িটি, ভাষা-রাগ ছিয়ানব্বইটি, বিভাষা-রাগ কুড়িটি ও অন্তর্ভাষা রাগ চারটি। এই সবই মার্গরাগ ও মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া অবশিষ্ট একুশটি রাগাঙ্গ, কুড়িটি ভাষাঙ্গ, পনেরোটি ক্রিয়াঙ্গ ও ত্রিশটি উপাঙ্গ। এগুলি দেশীরাগের অন্তর্গত।

'সংগীতরত্নাকরে' বাদ্যযন্ত্রের এক বিরাট তালিকা আছে। তৎকালে এগারো প্রকার বীণার প্রচলন ছিল— একতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রিকা, নকুল, বীণা, বিপঞ্চী, চিত্রা, মত্তকোকিলা, আলাপিনী, কিন্নরী, পিনাকী ও নিঃসঙ্ক বীণা। তা ছাড়া পনেরো রকম

বাঁশির বর্ণনা আছে। মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যের বিশদ বিবরণও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তৎসঙ্গে মৃদঙ্গের বোলগুলিও উদ্‌ধৃত হয়েছে। এগুলিকে শার্ঙ্গদেব 'পাঠ' নামে অভিহিত করেছেন।

এই তো গেল গীত ও বাদ্যের কথা। 'সংগীতরত্নাকরে' উল্লিখিত নৃত্যের অধ্যায়টিও কম মূল্যবান নয়। এ অধ্যায়ে শিরোভেদ হস্তভেদ বক্ষোভেদ পার্শ্বভেদ কটিভেদ চরণভেদ ইত্যাদি চৌত্রিশটি প্রয়োজনীয় নৃত্যসম্পর্কিত বিষয়ের বিশদ বিবরণ আছে। মূলতঃ গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিন কলাবিদ্যার একক অর্থে সংগীত শব্দটি প্রযোজ্য। সেই বিবেচনায় আলোচ্য গ্রন্থে এই তিন কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনার সমাবেশ ঐতিহ্য-মূলক ও যুক্তিসঙ্গত। শার্ঙ্গদেব-কৃত 'সংগীতরত্নাকরে'র পর অধিকাংশ সংগীতগ্রন্থ কেবলমাত্র গীত বা গীত-বাদ্য বিষয়ে বিরচিত।

আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকাল

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজির সময় থেকে হিন্দুস্থানী সংগীতের উন্নতির ধারা এক বিশিষ্ট পথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। তারপর থেকে দেখা যায় ভারতীয় সংগীতে বৈদিক প্রভাব কমে গিয়ে বিদেশী প্রভাব পড়তে শুরু করে। বর্তমান যুগে উচ্চাঙ্গ সংগীতের যে ধারাটি প্রচলিত তার সূচনা হয়েছিল সেই সময়েই। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি যে সংগীত-রসিক ছিলেন তা তাঁর সভার কবি আমীর খসরু, বৈজু বাওরা

ও নায়ক গোপাল এই তিন জন সংগীতদিক্‌পালের জীবনী পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়।

আমীর খসরু

আমীর খসরু পারস্যের অধিবাসী। সম্ভবত মহম্মদ বীন তুগলকের রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলাউদ্দিন খিলজির সভাতেই তাঁকে স্পষ্টরূপে দেখা যায়। আমীর খসরু পারস্যের এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি দার্শনিক সংগীতজ্ঞ ও রাজনীতি-বিদ্‌ ছিলেন। তিনি আলাউদ্দিনের শুধু সভাগায়কই ছিলেন না, তাঁর প্রধান মন্ত্রী ও ধর্মগুরুও ছিলেন। খসরু সুফী সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ফকির হন। তাঁর রচিত কবিতায় ও গানে গুজরাটী পারসিক এবং সংস্কৃত ভাষার সমন্বয় দেখা যায়। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

আমীর খসরু গায়ক হিসেবেও অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি **হিন্দুসংগীতে পারসিক প্রভাব** এনে-ছিলেন। ভারতীয় রাগের সহিত পারসিক রাগের মিশ্রণ করে খসরু অনেক রাগরাগিণী সৃষ্টি করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে **ইয়ামন্‌ বা ইমন্‌** রাগের উল্লেখ করা যায়। এই রাগটি ভারতীয় হিন্দোল রাগ ও পারসিক মোকাম রাগের মিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছে। আমীর খসরু পারসিক পদ্ধতিতে ভারতীয়

রাগরাগিণী গাইতেন। তাঁর পদ্ধতিতে বারোটি মোকাম বা রাগ, চব্বিশটি সুবা বা রাগিণী, আটচল্লিশটি গুস্তা বা উপরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পদ্ধতিকে কাওয়ালি-পদ্ধতি বলা বলা হয়। এই কাওয়ালি রীতি অনুযায়ী খেয়াল গান গাওয়া হয়ে থাকে। **আমীর খসরুই খেয়ালের উদ্ভাবক।** এই কাওয়ালি সংগীত ছাড়াও সংগীতক্ষেত্রে আমীর খসরুর আরো অনেক দান আছে। কাওল, কলবানা, তারানা, গুল্‌নক্‌স্‌, নিগার, গজল, সহলা ইত্যাদি নতুন নতুন পদ্ধতির গান এবং খম্‌সা, সওয়ারী, পহলওয়ান, যৎ, ফরোদস্ত ইত্যাদি তাল তাঁরই উদ্ভাবনা।

আমীর খসরু কণ্ঠসংগীতে যেমন খেয়াল গানের সৃষ্টি করে-ছিলেন যন্ত্রসংগীতেও তেমনি **সেতার** যন্ত্রের উদ্ভাবন করে-ছিলেন। সুদর্শন শাস্ত্রীর গ্রন্থে পাওয়া যায়, আমীর খসরু তিন-তারযুক্ত সেতার যন্ত্র প্রথমে তৈরি করেন। পারসিক ভাষায় 'সেহ' শব্দের অর্থ তিন। তিন তার-যুক্ত যন্ত্রের নাম তদনুযায়ী 'সেহতার' বা 'সেতার' রাখা হয়। সেতারে গৎ ও তোড়ারও প্রচলন করেন আমীর খসরু। তখনও সেতার যন্ত্রে আলাপ বাজাবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় নি। খেয়াল গান ও সেতার বাজনা উভয়ই কাওয়ালি-সংগীত নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সেতার ছাড়াও তবলা ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র আমীর খসরুরই উদ্ভাবনা।

নায়ক গোপাল

নায়ক গোপাল ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞানী ও সংগীতকলাকার। সংগীতে দ্বিগ্বিজয়ের মানসে তিনি দিল্লিতে উপস্থিত হন ; দিল্লির দরবারে তখন আলাউদ্দিন খিলজির সভাগায়ক হিসাবে আমীর খসরু অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিজে পরাজিত না হলেও নায়ক গোপাল আমির খসরুকে পরাজিত করতে পারেন নি। নায়ক গোপালের সংগীত-প্রতিভা আলাউদ্দিন খিলজির মনে বিস্ময় জাগিয়েছিল। ফলে নায়ক গোপাল দিল্লির দরবারে অন্যতম সভাগায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন।

নায়ক গোপালই মধ্যযুগে **হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রথম তত্ত্বসূত্রধর বা উপপত্তিক রূপকার।** তাঁর পূর্বেও এত বড়ো সংগীতজ্ঞানী ও সংগীতকলাকার অল্পই ছিলেন। কথিত আছে, নায়ক গোপাল নিজের বাড়িতে বসে যে-সব রাগ-রাগিণীর আলাপ করতেন আমীর খসরু তা আড়াল থেকে শুনে শিখে নিতেন এবং পরে তাদের এক-একটিকে পারসিক নামে অভিহিত করে নিজের সৃষ্টি হিসেবে দরবারে গেয়ে শোনাতেন। নায়ক গোপাল কতকগুলি নতুন রাগ সৃষ্টি করেন। পূর্বী, গৌরী, গুণকেলি, খট ও দেশকার রাগ তাদের অন্তর্গত।

বৈজু বাওরা

আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালে বৈজু বাওরা নামে তৃতীয় কলাবিদের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজু বনবাসী ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। শোনা যায়, তাঁর গানে বন্য পশুকুল মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হত। বৈজুর প্রতিভা আলাউদ্দিনের গোচরীভূত হলে তিনি তাঁকে দরবারে আহ্বান করেন। এই সময় নায়ক গোপাল ও আমীর খসরু উভয়েই দরবারে ছিলেন। বৈজুর কণ্ঠস্বর ও গান তাঁদের চেয়েও শ্রুতিমধুর ছিল। পাণ্ডিত্যে নায়ক গোপাল ও আমীর খসরু শ্রেষ্ঠ হলেও কলাবিদ্ হিসেবে বৈজুর তুলনা হয় না।

নায়ক গোপাল প্রাচীন ধরণের ছন্দোগান ও প্রবন্ধগান গাইতেন। কিন্তু বৈজু হিন্দুস্থানী প্রবন্ধ ও ধ্রুবা থেকে **হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের** সৃষ্টি করেন। এই ধ্রুপদ শিবমত বা রাগরাগিণী-পদ্ধতি অনুযায়ী সৃষ্ট হয়েছিল। বৈজুর ধ্রুপদে স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ চারটি তুক ছিল। এই সময় থেকে ছন্দোগান প্রবন্ধগান অপেক্ষা চার তুক-বিশিষ্ট ধ্রুপদই হিন্দুস্থানে প্রাধান্য লাভ করতে আরম্ভ করে। বৈজুর প্রবর্তিত ধ্রুপদ পদ্ধতি অনুসরণ করে নায়ক গোপালও অনেক ধ্রুপদ রচনা করেন। তাঁদের উভয়েরই রচিত ধ্রুপদের পদ অতি সুললিত ও মধুর। বৈজু বাওরা নিজের সাধন-ভজনেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। রাজদরবারে তাঁকে কমই দেখা যেত। বৈজু

বাওয়া ও নায়ক গোপালের পর দু'শ বছরের মধ্যে আর কোনো প্রসিদ্ধ ধ্রুপদজ্ঞের সন্ধান মেলে না।

রাগতরঙ্গিণীকার কবি লোচন

চতুর্দশ শতাব্দীতে কবি লোচন **রাগতরঙ্গিণী** নামে একখানি প্রসিদ্ধ সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন। কারো কারো মতে 'রাগ-তরঙ্গিণী' পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত ; কারণ ওই গ্রন্থে জয়দেব ও বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি হলেও বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আগে জন্মগ্রহণ করেন নি। কাজেই লোচন কবিকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক বা পরবর্তী বলেই মনে হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারতীয় সংগীতে নানা মুনির নানা মত দেখতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর বা ব্রহ্মার মত, ভরতের মত, হনুমন্ত মত, কল্লিনাথের মত, সোমেশ্বরের মত ইত্যাদি। কারো মতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, কারো মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিণী। আবার ছয় রাগ ছত্রিশ বা ত্রিশ রাগিণীর নামেও মতভেদ লক্ষিত হয়।

এই রাগরাগিণী-পদ্ধতি ভারতবর্ষে এই সময় পর্যন্ত একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উক্ত রাগরাগিণী-পদ্ধতির প্রাধান্যের যুগেও কবি লোচন প্রথম থাট-রাগ-পদ্ধতির প্রচলন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর **জনক-জন্য** পদ্ধতি অনুসারে **জনক মেল** ছিল বারোটি। কবি লোচনের

শুদ্ধ মেলের রূপ ছিল : স র জ্ঞ ম প ধ ণ র্স অর্থাৎ **বর্তমান কাফি থাটের** অনুরূপ। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়, এই শুদ্ধ মেল নাট্যশাস্ত্রকার ভরতোক্ত প্রাচীন ষড়্জ গ্রামের শুদ্ধ স্বরসপ্তকের সঙ্গে সাদৃশযুক্ত, যদিও ষড়্জ গ্রামের গান্ধার (জ্ঞ) ও নিষাদের (ণ) স্থান এবং বর্তমান কাফি মেলের কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের স্থান ভিন্ন।

রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিজয়নগর রাজদরবারে কল্লিনাথ নামে একজন প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞানী ছিলেন। তিনি শার্ঙ্গদেব-কৃত 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করে সংগীতজগতে এক স্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন। তাঁর টীকায় রাগ ও রাগিণী শব্দ দুটির ব্যবহার না থাকলেও শার্ঙ্গদেব রাগের নামকরণে যে স্ত্রীবাচক ও পুরুষবাচক শব্দের উল্লেখ করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে। কল্লিনাথ আরো বলেছেন, শিব ও শক্তি থেকে সকল রাগের উৎপত্তি। তাঁর মতে, **শুদ্ধ** রাগসকল শিবরূপী ; **সালংক** রাগসকল শক্তিরূপিণী, তাতে শক্তিগুণ বেশি ; আর উভয়ের মিশ্রিত রূপই **সংকীর্ণ** রাগ।

সুলতান হুসেন শর্কী

পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরে হুসেন শর্কী নামে একজন সংগীত-প্রেমিক বাদশা ছিলেন। আমীর খসরু-কর্তৃক উদ্ভাবিত

'কাওয়ালি খেয়াল' তখন বৈজু বাওরা -প্রবর্তিত ধ্রুপদ-পদ্ধতির সংগীতের জনপ্রিয়তায় একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে গিয়েছিল। হুসেন শর্কী সেই কাওয়ালি খেয়ালকে সাধারণের সমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগের তানসেন প্রমুখ বিখ্যাত ধ্রুপদজ্ঞের উজ্জ্বল প্রতিভালোকে খেয়াল গান পুনরায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। সুলতান হুসেন শর্কী কাওয়ালি খেয়াল ছাড়া **কলাবন্তী খেয়ালেরও** প্রচার করেছিলেন। কলাবন্তী খেয়াল বা বিলম্বিত খেয়াল তাঁরই উদ্ভাবনা। কয়েকটি নতুন রাগও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। জৌনপুরী, সিন্ধু-ভৈরবী, জৌনপুরী-তোড়ী, রামা-তোড়ী, রসুলী-তোড়ী, সিন্ধুড়া এবং বারো প্রকার শ্যাম রাগ— গৌড়শ্যাম, মল্লারশ্যাম, বসন্তশ্যাম ইত্যাদি রাগ হুসেন শর্কীর সৃষ্টি।

রাজা মান ও রানী মৃগনয়নী

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিকালে গোয়ালিয়র রাজ্যে রাজা মান নামে একজন সংগীতপ্রেমিক রাজা ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর পর ভারতীয় সংগীতাকাশে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল রাজা মান ও তদীয় পত্নী রানী মৃগনয়নীই সেই অন্ধকারে প্রথম উষালোক। রাজা মানের রাজত্বকাল ১৪৮৬-১৫১৬ খৃস্টাব্দ। তাঁর সভায় নায়ক চর্জ, নায়ক ধুন্দি প্রভৃতি গায়ক ছিলেন।

রাজা মান পূর্বে উল্লিখিত মৃগনয়নী নামে গুজরাটী রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। রানী মৃগনয়নীও সংগীতে বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। রাজা ও রানী প্রায়ই বৃন্দাবনে তাঁদের সংগীতসিদ্ধ গুরু **স্বামী হরিদাসের** নিকটে গান শিখতে যেতেন। রাজা মান, বৈজু বাওরা ও নায়ক গোপাল এই উভয় সংগীতগুণীর প্রবর্তিত ধ্রুপদ গানের অনুরূপ অনেক ধ্রুপদ রচনা করেন। রাজা মানের রচিত গান ও স্বামী হরিদাসের গান রানী মৃগনয়নী উত্তমরূপে গাইতে পারতেন বলে শোনা যায়। রাজার মৃত্যুর পর রানী আরো পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়েও তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে সংগীতচর্চা করেছেন। সংগীত-শিক্ষাদানেও তিনি অকৃপণ ছিলেন। মিয়া তানসেনের সংগীতপ্রতিভা বিকাশে রানী মৃগনয়নীর যথেষ্ট অবদান আছে। তানসেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপে রাণী মৃগনয়নীকে সম্বোধন করে অনেক ধ্রুপদ রচনা করেন।

কবীর

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বহু ভক্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই সংগীতকে ঈশ্বর উপাসনার মাধ্যম করে নিয়েছিলেন। ফলে এই সময়ে ভক্তি-সংগীতের ধারায় ভারতভূমি অভিষিক্ত হয়েছিল। সংগীতের ইতিহাসে এই-সব মহাপুরুষদের স্থান বড়ো বড়ো গায়ক বা সংগীতজ্ঞানীদের স্থানের চেয়ে একটুও নিম্নে নয়। অন্য

দিকে, এরূপ মহাপুরুষদের জীবনধারা থেকে শিক্ষণীয় অন্যতম একটি বিষয় হল এই যে, সংগীতের মৌলিক উদ্দেশ্যকে তাঁরা কিভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মার্গসংগীতে যেটি গোড়ার কথা, অর্থাৎ সুরের ও বাণীর সহযোগিতায় পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের আনন্দ উত্তরোত্তর উপলব্ধি করা, তার প্রধান প্রধান সূত্রগুলি এই-সব মহাপুরুষগণের জীবনে উত্তম-রূপে প্রতিভাত। ভক্ত কবীরের জীবনেও এই তত্ত্বটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মোগল রাজত্বকালে আনুমানিক ১৪০০ খৃস্টাব্দে ভক্ত কবীর জন্মগ্রহণ করেন। তন্তোজ বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর মাতৃভূমি বারানসী। কবীর **রামানন্দ স্বামীর** শিষ্য ছিলেন। আচার্য রামানুজ তাঁদের গুরুপরম্পরা-সম্পর্কিত। কবীর 'কবীর-পন্থী' নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। কবীর বহু কবিতা দোহা ও চৌপদী রচনা করেন। 'সুখনিধান' 'গোরক্ষনাথ কী গোষ্ঠী' 'কবীর পঞ্জিকা' 'আনন্দ রামসাগর' 'গীত' 'গীতহিন্দোল' 'বারোমাস্যা গীত' ও 'চাঁবর গীত' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সাধিকা মীরাবাঈ

মেবারের মহারানী মীরাবাঈ আনুমানিক ১৪২০ খৃস্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই তিনি সাধিকা ছিলেন ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে ভগবৎ-উপাসনা করতেন। মেবারের

মহারানা কুম্ভের (মতান্তরে ভোজরাজের) সহিত তাঁর বিবাহ হয়। শোনা যায়, স্বামীর জীবিতাবস্থাতেও মীরা সাধিকার জীবন যাপন করতেন। স্বামার মৃত্যুর পর তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাসিনী হয়ে যান। তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করে অবশেষে মীরাবাঈ তাঁর আরাধ্য গোবিন্দজীর আশ্রয় নেন।

মীরাবাঈ তানসেনের গুরু স্বামী হরিদাসের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। তিনি বহু **ভজন গানের** রচয়িত্রী। তাঁর ভজনের ভাষা ও ভাব অপূর্ব ভক্তিরসাপ্লুত। তিনি তাঁর ইষ্টদেবের কাছেই গান গাইতেন। সে-গান তিনি নিজে বা আর-কেউই কোনো দিন লিখে রাখতেন না। তাঁর ভজন তাঁর ভক্ত বা শিষ্য-শিষ্যার কণ্ঠে কণ্ঠে বাহিত হয়ে দেশকালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু সে-সব ভজনের আসল রূপটি গেছে হারিয়ে। মীরাবাঈর কণ্ঠে সে-সব ভজন গান কোন্ রাগে কোন্ তালে কোন্ ছন্দে ঝংকৃত হয়ে উঠত তা বোঝার আজ আর কোনো উপায় নেই।

বাবা রামদাস ও সাধক সুরদাস

১৫৫০ খৃস্টাব্দে বাবা রামদাস ও তাঁর পুত্র সুরদাস ভারতবিখ্যাত হয়েছিলেন। বাবা রামদাসের চেয়ে সুরদাসের প্রসিদ্ধি অনেক বেশি হয়েছিল। অনেকের ধারণা সুরদাস ও বিল্বমঙ্গল একই ব্যক্তি। সুরদাস অন্ধ ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি অন্ধ সুরদাস নামে খ্যাত হন। তিনিও গান গেয়ে ভগবৎ-উপাসনা

করতেন। **সুরসাগর** নামে সুরদাস-কৃত একখানি গ্রন্থ আছে। এটি ভজন সংগীতের গ্রন্থ এবং হিন্দি ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। ১৫৬৩ খৃস্টাব্দে এই ভক্তকবির দেহান্তর ঘটে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

ভারতের পূর্বপ্রান্তে বাংলা দেশের নবদ্বীপধামে ১৪৮৫ খৃস্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। তিনি একাধিক নামে খ্যাত ছিলেন, তার মধ্যে নিমাই ও শ্রীগৌরাঙ্গ নাম বিশেষ পরিচিত। তিনি সাহিত্য, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত ইত্যাদি বহু শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দিগ্বিদিকে ব্যাপ্ত হয়েছিল। প্রথমে লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। লক্ষ্মীদেবীর অকালমৃত্যু হলে মাতা শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁর পুনরায় বিবাহ দেন। পরে, কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় সংসার পরিত্যাগপূর্বক কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন ও শ্রীচৈতন্য নামে জগদ্বিখ্যাত হন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পরম ভক্তরূপে বাংলা দেশে বৈষ্ণবধর্মের বন্যা এনেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গান গেয়েই ভগবানের আরাধনা করতেন। তাঁর ভক্ত শিষ্যরাও এই গীতস্রোতে অন্তর্লীন হতেন। ভগবানের নামগান করে শ্রীচৈতন্য যে গীতধারার ফল্গু বইয়ে দিতেন তার নাম **কীর্তন**। তাঁর প্রবর্তিত নামকীর্তন আজও প্রচলিত

আছে। এই কীর্তন গান বাংলা দেশের এক গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে। কীর্তন বাংলা দেশের গীতরীতির ও গীতিপ্রকৃতির জাজ্বল্যমান প্রতীক। ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে পুরীধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে।

মহাকবি তুলসীদাস

মহাকবি তুলসীদাস বারানসীর একজন ভক্তকবি ছিলেন (১৫৮৪ খৃস্টাব্দ)। তিনি হিন্দি ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তুলসীদাসী রামায়ণ হিন্দি ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। রামায়ণের বহু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভক্তিরসে সিক্ত করে এই গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে। অদ্যাপি এই মহাকাব্যের রসাস্বাদনে বহু ভক্তজনচিত ভক্তিতে দ্রব হয়। তা ছাড়া, তুলসীদাস-রচিত বহু ভজন ও দোহা আজও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

স্বামী হরিদাস

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বামী হরিদাস গোস্বামী। তাঁর জন্ম-বৎসর সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও যতদূর অনুমান করা যায় তাঁর জন্ম ১৫১৩ খৃস্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম 'আসহীর' ও মাতার নাম 'গঙ্গাদেবী'। তাঁরা মূলতঃ পঞ্জাবের মুলতান জেলার অধিবাসী ছিলেন, পরে উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলায় পুনর্বসতি করেন।

পঁচিশ বছর বয়সে স্বামী হরিদাস গৃহত্যাগ করে ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে আসেন। তার আগেই তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে কিছুটা শিক্ষালাভ করেছিলেন, মনে হয়। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক একজন সাধক কবি ও সংগীতজ্ঞ সন্ন্যাসীই ছিলেন হরিদাসের সন্ন্যাস জীবনের সংগীতগুরু।

স্বামী হরিদাস বৃন্দাবনে তাঁর ইষ্টবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারা জীবন এই বিগ্রহের সেবায়, সংগীতসাধনায় ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন। তিনি একজন বড়ো কবিও ছিলেন। তাঁর রচিত 'সাধারণ সিদ্ধান্ত' ও 'শৃঙ্গার রসকী পদ' গ্রন্থ দুখানি সাহিত্যসম্পদে অতুলনীয়। তাঁর গ্রন্থে বিভাস, বিলাবল, কল্যাণ, কানাড়া, গৌরী, বসন্ত, সারং, নট, আশাবরী ইত্যাদি রাগের নাম পাওয়া যায়।

মিঁয়া তানসেন হরিদাস স্বামীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শিষ্য হলেও ঠাকুর নরোত্তম, বিট্ঠল, মাধব দাস, ভাগবৎস্বামী, নায়ক বৈজুনাথ, মিশ্র সিংজী, রাজা মান ও রানী মৃগনয়নী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত শিল্পী স্বামী হরিদাসের শিষ্যত্বে ধন্য ছিলেন। স্বামী হরিদাস হরিদাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলে অনেকে তাঁকে বাঙালী বলে মনে করেন। তবে এ মত প্রামাণিক নয়। ১৬০৮ খৃস্টাব্দে স্বামী হরিদাসের দেহান্তর ঘটে।

শাহানশা আকবরের রাজত্বকাল

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের সুনাম যেমন সুবিদিত, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর নাম তেমনি চিরস্মরণীয়। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে তিনি কেবলমাত্র প্রজাপালনই করেন নি, ললিতকলার ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব বড়ো কম নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা কলাবিদ্যার পরিপোষণে আকবর যথেষ্ট সাহায্য ও সহায়তা করেছিলেন। তাঁর দরবারের নবরত্নের এক-একজন ছিলেন মহাপণ্ডিত ও প্রতিভাধর ব্যক্তি। দেশের শ্রেষ্ঠ গুণীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই নবরত্নসভা। আকবর বিশেষ করে সংগীতের একজন বড়ো সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নবরত্ন সভার মধ্যমণি ছিলেন সংগীতসম্রাট তানসেন। আকবরের দরবারে থাকাকালীনই তানসেনের প্রতিভাতরু পত্রপুষ্পফলে বিকশিত হয়েছিল।

তানসেন

মিয়া তানসেন **মুকুন্দরাম পাঁড়ে** নামক এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের গৃহে আনুমানিক ১৫০৫ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৫৩২ খৃস্টাব্দে। মুকুন্দরাম পাঁড়েকে কেউ কেউ মকরন্দ পাঁড়ে নামেও অভিহিত করেন। তানসেনের পিতা মুকুন্দরাম বারানসীতে **কথকতায়** জীবিকা অর্জন করতেন বলে শোনা যায়। মতান্তরে তাঁরা গোয়ালিয়রের

অধিবাসী ছিলেন। মনে হয়, শেষোক্ত মতই অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য।

তানসেনের হিন্দুনাম ছিল রামতনু পাঁড়ে। বাল্যকালে রামতনু অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন বলে শোনা যায়। কথিত আছে, স্বামী হরিদাস তীর্থপর্যটন উপলক্ষে সশিষ্য কাশীধামে (?) এসেছিলেন। সেই সময় একদিন তাঁরা যখন কাশীর উপকণ্ঠে এক অরণ্যে প্রবেশ করেন তখন বালক রামতনু কৌতুকচ্ছলে বাঘের ডাক ডেকে তাঁদের ভয় দেখান। তাঁর কণ্ঠের অদ্ভুত অনুকরণ-ক্ষমতা দেখে স্বামী হরিদাস মুগ্ধ হন এবং তাঁকে **নাদবিদ্যায়** পারদর্শী করার জন্যে নিজের সঙ্গে বৃন্দাবনে নিয়ে যান। এ ঘটনা কতদূর সত্য জানা যায় না। তবে দশ বছর বয়সে-যে রামতনু সংগীতশিক্ষার জন্যে স্বামী হরিদাসের কাছে বৃন্দাবনে আসেন এবং তাঁর অসাধারণ সংগীতপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে স্বামীজি তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্রমান্বয়ে দশ বছর রামতনু হরিদাস স্বামীর নিকটে সংগীত শিক্ষা করেন। কিন্তু পিতার মরণাপন্ন অবস্থার সংবাদ পেয়ে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই গৃহে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

কথিত আছে, মৃত্যুকালে মুকুন্দরাম রামতনুকে তাঁর ধর্মপিতা **মহম্মদ গওসের** পরিচয় দিয়ে যান। মুকুন্দরামের পত্নী মৃতবৎসা ছিলেন। রামতনুর পূর্বে তাঁর অনেক পুত্র-সন্তান জন্মেছিল, কিন্তু একজনও বাঁচে নি। তখন তাঁরা গোয়া-

লিয়রের হজরত মহম্মদ গওস নামক এক সিদ্ধ পীরের শরণাপন্ন হন। শোনা যায়, তাঁর শুভাশীর্বাদের ফলেই রামতনুর জন্ম হয় ও তিনি দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হন। মৃত্যুশয্যাশায়ী মুকুন্দরাম পুত্র রামতনুকে মহম্মদ গওসের নিকটে যাওয়ার জন্যে আদেশ করেন। সেই আদেশ অনুসারে পিতার মৃত্যুর পর রামতনু গোয়ালিয়রে মহম্মদ গওসের আশ্রয় নেন।

রামতনু ঠিক কী কারণে মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করেন তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কারো কারো মতে তিনি তাঁর ধর্মপিতা মহম্মদ গওসের প্রভাবে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, হোসেনী ব্রাহ্মণী নামক এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

হোসেনী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে রামতনুর যোগাযোগ ও পরিচয় এক নাটকীয় ঘটনার ন্যায়। গোয়ালিয়র রাজপ্রাসাদে রানী মৃগনয়নীর সংগীতচর্চা তখনও অব্যাহত ছিল। মহম্মদ গওসের প্রভাবে রামতনু রানীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। রানীর শিষ্যাদের মধ্যে হোসেনী ব্রাহ্মণী ছিলেন মুসলমান ধর্মান্তরিতা ব্রাহ্মণী কন্যা। হোসেনীর হিন্দুনাম ছিল প্রেমকুমারী। তাঁর পিতা সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে সপরিবারে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রেমকুমারী তাঁরই কন্যা। ধর্মান্তর গ্রহণের পর প্রেমকুমারীর ইস্‌লামী নাম 'হোসেনী' রাখা হয়— ব্রাহ্মণকন্যা বলে তাঁকে সবাই 'হোসেনী

ব্রাহ্মণী' বলে ডাকত। এই হোসেনী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে রামতনুর পরিচয় এবং শেষে প্রণয় হয়। রানী মৃগনয়নীর সস্নেহ যোগা-যোগে শেষ পর্যন্ত উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। মুসলমান হওয়ার পর রামতনুর নাম হয় **মহম্মদ আতা আলি খাঁ।** এই বিবাহ এবং ধর্মান্তরে স্বামী হরিদাসের অমত ছিল না বলেই অনুমান হয়। কারণ বিবাহের পর ধর্মান্তরিত রামতনু পুনরায় স্বামীজির নিকটে ফিরে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়। মহম্মদ গওসের মৃত্যুকালে রামতনু তথা আতা আলি খাঁকে আবার গোয়ালিয়রে ফিরে যেতে হয়। মহম্মদ গওসের মৃত্যুর পর তাঁর অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তিনি স্থায়ীভাবে গোয়ালিয়রবাসী হন।

স্বামী হরিদাসের নিকট যোগসাধনা ও সংগীতশিক্ষার জন্যে আতা আলি খাঁ (তানসেন) নিয়মিতভাবে বৃন্দাবনে যেতেন। তাঁর সাধনা যখন পূর্ণপ্রায় তখন রেওয়ার মহারাজা রাজা রামের সভায় তিনি সভাগায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই রাজসভা থেকেই তাঁর সুরঝংকার দিল্লির সিংহসনারূঢ় আকবরের কর্ণগোচর হয়।

আকবরের সাদর আহ্বানে তাঁকে দিল্লি যেতে হয়। আকবর তাঁর সংগীত শুনে বিস্ময়াভূত হয়ে তাঁর বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়েন। আতা আলি খাঁকে বাদশাহ **তানসেন** উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধির অর্থ যিনি : সংগীতে 'তান' (সুরলহরী) দ্বারা 'সৈন' অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত করতে

পারেন তিনিই 'তানসেন'। বাদশাহ আকবর তানসেনের এতই গুণগ্রাহী ভক্ত হয়ে পড়লেন যে তানসেনকে না হলে তাঁর এক দণ্ডও চলত না। আকবরের সভায় অন্য যে-সব গায়ক ছিলেন তাঁরা তানসেনের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর ক্ষতি করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তানসেন তাঁর বুদ্ধিবলে এবং সংগীতপ্রতিভাগুণে প্রত্যেক বারই অপরাজিত ও অটল থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তানসেন হিন্দুস্থানী সংগীতের ধ্রুপদ-পদ্ধতিকেই গৌরবান্বিত করেছেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তাঁর ধ্রুপদ গৌড়ীয়, গৌড়হার বা গওহার শ্রেণীভুক্ত। তিনি প্রাচীন গীতের তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না। তা ছাড়া মুসলমান প্রভাবযুক্ত খেয়াল গানও তাঁর তেমন পছন্দ ছিল বলে মনে হয় না।

তানসেন বৈজু বাওরা -প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে গঠিত চার তুক -বিশিষ্ট ধ্রুপদ গাইতেন। তানসেন-কর্তৃক সৃষ্ট নতুন রাগের সংখ্যা বহু। তার মধ্যে দরবারী কানাড়া, মিঁয়া মল্লার, মিঁয়া কী তোড়ী, মিঁয়া কী সারং ইত্যাদি অনেক রাগ আজও তাঁর নামে প্রচলিত আছে। তানসেন হিন্দু ও পারসিক সংগীতের সুষ্ঠু মিলনসাধন করেছিলেন। তাঁর অকৃত্রিম প্রভাবে এই মিলনের দ্বারা ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল।

তানসেনের সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধেও একটি গল্প প্রচলিত আছে।

আকবরের অন্যান্য সভাগায়করা জানতেন, যত বড়ো গায়কই হোক না কেন দীপক রাগ গাইলে তার আর রক্ষা থাকবে না। ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে তাই তাঁরা আকবরকে অনুরোধ করলেন তানসেনের দ্বারা দীপক রাগ পরিবেশন করবার জন্যে। তানসেন তাঁদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর কন্যা **সরস্বতী** এবং গুরুভগ্নী **রূপমতীকে** উত্তমরূপে **মেঘ** রাগ শিক্ষা দিয়ে রেখেছিলেন। দীপক রাগ গাওয়ার পর সমস্ত সভাগৃহে নাকি আগুন জ্বলে উঠেছিল। সভাসদ্‌রা প্রাণভয়ে সম্রাটকে নিয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। তানসেন সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেও রক্ষা পেলেন না। তাঁর সমস্ত দেহে অগ্নিপ্রদাহ আরম্ভ হল। তখন তাঁরই নির্দেশে সরস্বতী ও রূপমতী মেঘ রাগ গাইতে আরম্ভ করলেন। এই রাগের প্রভাবেই নাকি তানসেন সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি হন নি। তারপর তিনি রাজসভা থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং কিছু দিন পরে তাঁর জীবনাবসান হয়।

এ গল্পটি একেবারে মিথ্যা নাও হতে পারে। রাগরাগিণীর প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বিষয় প্রাচীন যুগের আভিচারিক সংগীতে দেখতে পাওয়া যায়। তানসেনের গুরু ছিলেন একজন হিন্দু মহাতাপস। তিনি ব্রাহ্মণসন্তান তানসেনকে আভিচারিক সংগীতে শিক্ষিত করেছিলেন কিনা সে কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর দিল্লির দরবারে সগৌরবে অধিষ্ঠিত

থাকার পর ১৫৮৫ খৃস্টাব্দে দিগ্বিজয়ী সংগীতসম্রাট তানসেন পরলোকগমন করেন।

তানসেন নিজে গায়ক হলেও যন্ত্রসংগীতেও তাঁর দান সামান্য নয়। রবাব বা রুদ্রবীণার উদ্ভাবনা তাঁরই প্রতিভাপ্রসূত। তানসেনের এই উদ্ভাবনার ফলে যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে এমন একটা নূতন ধারা এনেছে যা প্রাচীন ভারতের বীণাবাদন-পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। তানসেন নিজেও উত্তম রবাব-বাদক ছিলেন। তান-সেনের দীপক রাগ গাওয়ার কালে তাঁর কন্যা সরস্বতী দেবীর পরিচয় সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সরস্বতী দেবীর স্বামী অর্থাৎ তানসেনের জামাতা মিশ্রি সিংজী বীণাবাদনে সিদ্ধ ছিলেন। তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর বংশে তানসেনের সাধনা ও মিশ্রি সিংজীর বংশে বীণাসাধনা বংশপরম্পরাক্রমে চলে এসেছে। এই উভয় বংশের সংগীতবিদ্যা পরস্পরের সংযোগে সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল। মিশ্রি সিংজীর পত্নী সরস্বতী দেবীর কণ্ঠসংগীতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি নিবন্ধন তাঁর বংশের বীণাকারগণ কণ্ঠসংগীতেও দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তানসেনের পুত্র ও কন্যা উভয় বংশেই কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে প্রতিভাধর অনেক গুণী জন্মগ্রহণ করেছেন।

তানসেন ছাড়াও দিল্লির দরবারে পূর্বাপর অনেক সংগীত-গুণীর নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। তার মধ্যে মিঁয়া খোদাবক্স, মিঁয়া মসনদ আলি খাঁ, বাবা রামদাস, রামদাসের পুত্র সুরদাস, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, বীণাকার নবাৎ খাঁ, বাজ বাহাদুর, কেল

শশী, তানসেনের চার পুত্র— সুরৎসেন, সরৎসেন, তরঙ্গসেন ও বিলাস খাঁ, তানসেনের শিষ্যদ্বয়— তানতরঙ্গ ও মানতরঙ্গ, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

তা ছাড়া তখৎবখৎ খোদা বক্স, খাণ্ডে রাও, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, মাহমুদ খাঁ, জগবৎ পাখোয়াজী— এঁরাও সভায় উপস্থিত থাকতেন। আরও তিনজন গুণী মাঝে মাঝে দিল্লিতে আসতেন। তাঁরা সকলেই হরিদাস স্বামীর শিষ্য। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্রিজচন্দ্রের (ব্রজচাঁদ) বাড়ি ছিল দিল্লির নিকট ডাগুর গ্রামে। তাঁর পরিবেশিত ধ্রুপদকে বলা হত ডাগর বাণীর ধ্রুপদ। রাজপুত শ্রীচন্দের (শ্রীচাঁদ) বাড়ি ছিল নৌহার। তাঁর পরিবেশিত ধ্রুপদকে বলা হত নৌহার বাণীর ধ্রুপদ। রাজপুত রাজা সমোখন সিংহের বাস ছিল খণ্ডার নামক স্থানে। তাঁর ধ্রুপদ-পদ্ধতিকে বলা হত খাণ্ডার বাণীর ধ্রুপদ।

পুণ্ডরীক বিট্টল

আকবর বাদশাহের দরবারে আরো একজন বড়ো সংগীতকলা-কার ছিলেন। তাঁর নাম পুণ্ডরীক বিট্টল। তিনি দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। ১৫৯৯ খৃস্টাব্দে আকবর খান্দেশ জয় করেন। তখন এই সংগীতগুণীর পরিচয় পেয়ে তিনি সাদর আমন্ত্রণে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে আসেন।

পুণ্ডরীক বিট্টল সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লেখা **সদ্‌রাগচন্দ্রোদয়, রাগমালা, রাগমঞ্জরী ও নর্তন-নির্ণয়**

গ্রন্থ বিকানীর রাজপাঠাগারে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। 'সদ্‌রাগচন্দ্রোদয়ে' উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় উভয় সংগীত-পদ্ধতিরই বিশদ বিবরণ আছে। পুণ্ডরীক বিট্টল **ঠাট-রাগ** পদ্ধতির প্রচারক ছিলেন। তাঁর মতে শুদ্ধ ঠাট বর্তমান **কাফি** এবং ঠাট-সংখ্যা বাইশ।

নায়ক বৈজু

আকবরের দরবারে ক্রিয়াত্মক সংগীতে তানসেনের পরই নায়ক বৈজু বা বৈজুনাথের স্থান। ইনিও স্বামী হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, তানসেনের সঙ্গে নায়ক বৈজুর সংগীত-প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তাঁর সৃষ্ট রাগগুলির মধ্যে লঙ্কাধন (লঙ্কাদহন) সারং ও ধুরিয়ামল্লার উল্লেখযোগ্য।

বিলাস খাঁ

বিলাস খাঁ ছিলেন তানসেনের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তানসেনের যখন পঁচাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হয় তখন তিনি একবার তাঁর পুত্রদের সংগীতশিক্ষার পরীক্ষা নিয়েছিলেন। পরীক্ষার বিষয় ছিল বাদশাহ আকবরের নামে একটি সংগীত রচনা। এই পরীক্ষায় বিলাস খাঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সরৎসেন, সুরৎসেন ও তরঙ্গসেন অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেন। বিলাস খাঁর গান শুনে বাদশাহ আকবর ও তাঁর সভাসদেরা মুগ্ধ হন এবং একবাক্যে স্বীকার করেন যে হরিদাস স্বামী এবং তানসেনের পর বিলাস খাঁই একমাত্র উপযুক্ত গায়ক।

কথিত আছে যে তানসেনের মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি তাঁর সংগীতের যথার্থ উত্তরাধিকারী নির্ণয় করার জন্যে একটি শর্ত রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর মৃতদেহের চার পাশে যেন তাঁর পুত্রগণ ও শিষ্যগণ গান করেন। সেই গান শুনে তানসেনের মৃতদেহের ডান হাত যার দিকে নির্দেশ করবে সেই হবে তাঁর বংশের সংগীতধারার শ্রেষ্ঠ বাহক। শোনা যায়, বিলাস খাঁর দিকেই নাকি তানসেনের ডান হাতের এক অঙ্গুলি উত্তোলিত হয়েছিল।

পিতা তানসেনের অশেষ গুণের উত্তরাধিকারী হয়েও বিলাস খাঁ রাজদরবারে থাকতেন না। তিনি ছিলেন বনবাসী সন্ন্যাসী। তাঁর অন্যান্য ভাইরা রাজদরবারে যেতেন ও বাদ-শাহের কাছে প্রচুর পারিতোষিক পেতেন। একবার বিলাস খাঁর পত্নী ও পুত্রের খুব দৈন্য উপস্থিত হয়। তখন পত্নীর বিশেষ অনুরোধে তিনি দরবারে যান ও তাঁর সুললিত সংগীত পরিবেশন করে প্রচুর পারিতোষিক লাভ করেন। লব্ধ পারিতোষিক পত্নীকে দিয়ে পুনরায় তিনি অরণ্যে চলে যান। তারপর আর সংসারে ফেরেন নি।

বিলাস খাঁ রবাব, বীণা ও কণ্ঠসংগীতে সিদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্ত বৈরাগী। তাঁর তুল্য সাধক ও সাধুপুরুষ সংগীতজগতে খুবই বিরল। আজও তিনি সারা ভারতে পূজিত। তিনি একপ্রকার তোড়ি রাগ সৃষ্টি করেছেন —বিলাসখানি তোড়ি নামে আজও তা প্রচলিত আছে।

বিলাসখানি তোড়ি মধুর ও জনপ্রিয় রাগ। উদয়সেন ও দয়ালসেন নামে বিলাস খাঁর দুই পুত্র ছিল। মসিদ্‌খানি বাজনার স্রষ্টা মসিদ্ খাঁ বিলাস খাঁরই বংশধর।

বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে হরিদাস স্বামী, তানসেন, বিলাস খাঁ প্রভৃতি বিশিষ্ট সংগীতগুণীগণ সাধক শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন এবং ভারতীয় সংগীতের ধারার মধ্য দিয়ে তাঁরা একটি সুপ্রাচীন সাধনধারাও বহন করে চলেছিলেন।

নবাৎ খাঁ (মিশ্রি সিং)

আজমীড়ের সিংহল গড়ের রাজা সমুখন সিং একজন বিদ্যোৎসাহী ও সংগীতকুশলী রাজা রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক রাজা। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে সমুখন সিংয়ের পরাজয় হয়। রাজ্য হারাবার কিছুদিন পরে অরণ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি হরিদাস স্বামীর শিষ্য ও বীণাযন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

রাজা সমুখন সিংয়ের পুত্র **মিশ্রি সিং** পিতার মৃত্যুর পর সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন ও সংগীতসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। মিশ্রি সিং বীণা যন্ত্রের ক্রিয়াঙ্গে এত উন্নত ছিলেন যে তৎকালে উত্তর ভারতে তাঁর সমকক্ষ কোনো বাদক ছিল না। একবার বাদশাহ আকবর মৃগয়া করতে গিয়ে অরণ্যস্থিত এক শিবমন্দিরে মিশ্রি সিংকে বীণাবাদনরত অবস্থায় দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর পরিচয় জানতেন না। মিশ্রি সিংয়ের অপূর্ব বীণাবাদন

শুনে বাদশাহ তাঁর পরিচয় জানতে চান ; এবং পরিচয় পেয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে সেই গুণী শিল্পীকে নিজ দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মিশ্রি সিংয়ের কাজ ছিল তানসেনের গানের সঙ্গে বীণা বাজিয়ে সহযোগিতা করা। একবার তানসেনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়, যার ফলে মিশ্রি সিংয়ের শাক্ত রক্ত প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি সভাগৃহের প্রাচীরগাত্র থেকে একটি খড়্গ তুলে নিয়ে তানসেনকে বধ করতে গিয়ে কৃতকার্য না হয়ে আহতমাত্র করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আকবর মিশ্রি সিংয়ের মতো গুণীকে হারানোর ক্ষতি মেনে নিতে পারেন নি। অবশেষে তাঁর বহু কৌশলে মিশ্রি সিং তানসেনের ক্ষমালাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এই দুই গুণীশ্রেষ্ঠকে স্থায়ীভাবে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ রাখবার জন্যে আকবর মিশ্রি সিংয়ের সহিত তানসেনের কন্যা সরস্বতীর বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বিবাহের জন্যে মিশ্রি সিংকে মুসলমান হতে হয় এবং তাঁর নাম হয় **নবাৎ খাঁ**। মিশ্রি সিং খাণ্ডার বাণীর ধ্রুপদকেই বীণাযন্ত্রে রূপ দিতেন। মিশ্রি সিংও সরস্বতীর বংশধরগণ তানসেনের বীণকার বংশ নামে পরিচিত।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল

জাহাঙ্গীর নিজে তেমন সংগীতপ্রেমিক না হলেও তাঁর দরবারে সংগীতের সমাদর যে একেবারে ছিল না এ কথা বলা যায় না।

তাঁর দরবারে জাহাঙ্গীর দাহু, ছতর খাঁ, পরবেজ দাদ এবং খুররম দাদ প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে এবং উত্তর ভারতীয় সংগীত -পদ্ধতিতেও সংগীতগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

সোমনাথ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজমুন্দ্রী নিবাসী তেলেগু ব্রাহ্মণপণ্ডিত সোমনাথ দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে **রাগবিবোধ** নামক একখানি প্রামাণিক সংগীতপুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের টীকাকারও সোমনাথ। মধ্যযুগে বিশেষত তার শেষাংশে নানা কারণে ভারতীয় সংগীতের ক্রিয়ায় ও তত্ত্বে নানা অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হয়। সোমনাথ তাঁর 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে তাঁর-কৃত প্রাঞ্জল টীকাসহ এই অসামঞ্জস্য দূরীকরণের চেষ্টা করেন। সেই হিসেবে দক্ষিণভারতীয় পদ্ধতিতে লিখিত হলেও গ্রন্থকারের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

পণ্ডিত দামোদর মিশ্র

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারের দামোদর মিশ্র নামে একজন সংগীতজ্ঞানী **সংগীতদর্পণ** নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে রাগাধ্যায়ের আলোচনা অভিনব। 'সংগীতদর্পণে' গ্রন্থকারের স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

যেমন, গ্রন্থকার রাগরাগিণীকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করে তাদের রূপ রস ও রূপধ্যান সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে রাগকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হোক বা না-হোক রাগ-রূপায়ণের জন্যে রাগের রসরূপ ও ভাবরূপ সম্বন্ধে অবহিত থাকা আবশ্যক।

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল

সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে (১৬২৮-১৬৬৬ খৃস্টাব্দ) রাজদরবারে বহু সংগীতপণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। শাহ্‌জাহান সংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শুধু সংগীত কেন অন্যান্য কলাবিদ্যারও তিনি একজন উত্তম গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর অমর কীর্তি তাজমহলে স্থপতিবিদ্যায় তাঁর গুণগ্রাহিতার স্বাক্ষর ভাস্বর হয়ে আছে। শোনা যায়, শাহ্‌জাহান নিজেও সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

পণ্ডিত অহোবল

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে পণ্ডিত অহোবল নামে একজন সংগীতজ্ঞানী **সংগীতপারিজাত** নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ভারতীয় সংগীতে একখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ১৭২৪ খৃস্টাব্দে 'সংগীতপারিজাত' পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে পণ্ডিত অহোবল নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বীণার তারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থাননির্ণয়ের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই

এই পদ্ধতির কিছুটা পরিচয় মেলে। সম্ভবত এই পদ্ধতি ভরতের পূর্ববর্তীকালের উদ্ভাবনা। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। পণ্ডিত অহোবল তাঁর গ্রন্থে এই পদ্ধতিকে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। 'সংগীতপারিজাতে' একুশ-বাইশটি রাগের নাম পাওয়া যায়।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল

ঔরঙ্গজেব সংগীত-বিরোধী বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজত্ব-কালে (১৬৫৮-১৭০৭ খৃস্টাব্দ) তাঁর কঠোর আদেশে ভারতীয় সংগীতের ধারা প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজদরবারের সমস্ত গায়কগায়িকা রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হয়েছিল। জীবিকা অর্জনের জন্য তখন তাদের হয় সংগীত ছেড়ে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল, নয় ঔরঙ্গজেবের খাস রাজত্বের বাইরে দেশীয় রাজাদের রাজ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ঔরঙ্গজেব আইন করে সবরকম সংগীতের চর্চা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে তৎকালে উত্তর ভারতে সংগীতের কোনো স্ফুরণ হয় নি।

পণ্ডিত ব্যঙ্কটমোখী

এই কালে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যঙ্কটমোখী **চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা** নামে একখানি সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সপ্তকের বারোটি স্বর দ্বারা কি ভাবে বাহাত্তরটি ঠাট এবং কেবলমাত্র বাহাত্তরটি ঠাটই উৎপন্ন হতে পারে তার

বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এই মতের অনেকটা গ্রহণ ও অবলম্বন করে তাঁর বর্তমান সংগীত-পদ্ধতি প্রচলিত করেছেন।

পণ্ডিত ভাবভট্ট

এই কালেই পণ্ডিত ভাবভট্ট নামে এক সংগীত-বিদ্বানের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত ইনি আকবরের সভার জগন্নাথ কবিরাজের পুত্র। ভাবভট্ট 'অনুপবিলাস' 'অনুপাঙ্কুশ' ও 'অনুপসংগীতরত্নাকর' নামক তিনখানি সংগীতগ্রন্থের রচয়িতা।

মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল

ঔরঙ্গজেবের পর ভারতীয় সংগীতে এক তমসাবৃত যুগ এসেছিল বলা যেতে পারে। ঔরঙ্গজেবের সংগীত-বিরোধিতা ভারতীয় সংগীতের মূল-ধারাটিকে প্রায় লুপ্ত করে দিয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে মহম্মদ শাহ্ তাঁর রাজত্বকালে (১৭১৯ খৃস্টাব্দ) এই লুপ্তপ্রায় সংগীতের আংশিক পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর চেষ্টায় ভারতীয় সংগীতে আবার তার পূর্বগৌরব কতকাংশে ফিরে এসেছিল। এই সময়েও প্রসিদ্ধ গায়কগণ দিল্লির দরবার অলংকৃত করেছিলেন। এই গায়কগণের মধ্যে তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় নিয়ামৎ খাঁ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নিয়মৎ খাঁ (শাহ্ সদারঙ্গ)

নিয়ামৎ খাঁ তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় ছিলেন। তানসেনের

জামাতা নবাৎ খাঁ (মিশ্রি সিং) তাঁর পূর্বপুরুষ। তানসেনের দৌহিত্র বংশের ধারা অনুযায়ী নিয়ামৎ খাঁ বীণাবাদক ছিলেন। তখনকার দিনে উৎকৃষ্ট বাদকের চেয়েও গায়কের সম্মান বেশি ছিল। নিয়মাৎ খাঁ এই রীতিতে অপমানিত বোধ করেন ও দরবার পরিত্যাগ করেন। মতান্তরে, তিনি বারবধূদের সংগীতশিক্ষা দানে অসম্মত হওয়ায় বাদশাহ তাঁকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর নিয়ামৎ খাঁ দিল্লির দুটি মধুরকণ্ঠ ভিক্ষুক বালককে (জানি রসুল ও গোলাম রসুল) নিজের গৃহে বারো বৎসর সংগীতশিক্ষা দেন। তিনি বুঝেছিলেন, সংগীতজগতে কিছু দান না করতে পারলে সম্মান পাওয়া যাবে না। তাই তিনি আমীর খসরু -প্রবর্তিত ও সুলতান হুসেন শর্কী প্রভৃতি সংগীতকলাকারের অনুসৃত কাওয়ালি রীতির সঙ্গে আলাপ ও ধ্রুপদ রীতির সংযোজনে এক অভিনব খেয়াল-পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। এই খেয়াল গায়ন-পদ্ধতিতে বালক দুটিকে নিপুণ করে বাদশাহের দরবারে পাঠিয়ে দেন। তাদের গান শুনে সপরিষদ মহম্মদ শাহ্ মুগ্ধ হন এবং তাদের গুরুর পরিচয় পেয়ে মহাসমাদরে নিয়ামৎ খাঁকে দরবারে পুনঃ অধিষ্ঠিত করেন। কালক্রমে নিয়ামৎ খাঁ বাদশাহের এমন প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন যে বাদশাহ তাঁকে **শাহ্ সদারঙ্গ** উপাধিতে ভূষিত করেন।

শাহ্ সদারঙ্গ বহুসংখ্যক খেয়াল গানের স্রষ্টা। তাঁর রচিত গান আজও হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। বহু খেয়াল

গানেই সদারঙ্গিলে বা সদারঙ্গ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সদারঙ্গ আর-একটি কৌশল করেছিলেন। তিনি তাঁর অনেক গানে মহম্মদ শাহ্ বাদশাহের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর গানগুলি প্রসিদ্ধ হওয়ার তাও একটা কারণ।

সদারঙ্গের খেয়াল কাওয়ালি গান অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কাওয়ালি মধ্য লয়ে গাওয়া হত, এতে বিলম্বিত লয়ের প্রয়োগ নেই, রাগ কিম্বা তানের বিস্তারও নেই; গানের অঙ্গেই তান গ্রথিত থাকত অথবা দু-চারটি ছেটো ছোটো তান ব্যবহার করা হত। আকবরের সময়ে বাজবাহাদুর, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, সেখ বাহাউদ্দিন, চির মহম্মদ প্রভৃতি গায়কগণ কাওয়ালি গানকে হালকা ধরনের গান হিসেবেই গাইতেন। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী বিলম্বিত লয়ে খেয়াল রচনা করেন ও 'খেয়াল' নামকরণ করেন। তাও খেয়াল গানের প্রাথমিক অবস্থা। সদারঙ্গ খেয়ালে যে ধরণের গায়কির প্রবর্তন করেন তাতে ধ্রুপদের ন্যায় বিলম্বিত লয়ের স্থায়ী ও অন্তরাযুক্ত খেয়াল, দ্রুত লয়ের খেয়াল এবং বিলম্বিত খেয়ালের পদের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ বিলম্বিত আলাপের পন্থা প্রদর্শন করেন। বীণার গমক ও জোড়ের অনুকরণে তিনি গমক তানের প্রবর্তন করেন। তা ছাড়া শাহ্ সদারঙ্গ ধামারেরও শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। শুধু কণ্ঠসংগীতের নয়, আমীর খসরু-প্রবর্তিত সেতারেরও তিনি উন্নতি সাধন করেন। তিনি সেতারে তিন তারের পরিবর্তে সাত তারের প্রবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন করেন। সদারঙ্গের সময় থেকেই

যন্ত্রসংগীতের মর্যাদা বেড়ে যেতে থাকে। মসীদ্‌খানি বাজনার প্রবর্তক মসীদ্ খাঁ সদারঙ্গের শিষ্য ছিলেন।

অদারঙ্গ

অনেকে বলেন অদারঙ্গ সদারঙ্গের ভ্রাতা, আবার কেউ কেউ বলেন পুত্র। মহম্মদ শাহের দরবারে সদারঙ্গের সঙ্গে অদারঙ্গেরও নাম পাওয়া যায়। তিনি বীণকার ও গায়ক ছিলেন। অদারঙ্গ সম্ভবত ভিক্ষুকবংশের সন্তান। 'অদারঙ্গ' মোগল দরবারের উপাধি। তাঁর আসল নাম ফিরোজ খাঁ। তিনি 'ফিরোজখানী তোড়ী' নামে একটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। অদারঙ্গ ধামার ও খেয়াল ভালো গাইতেন। খেয়ালের উত্তম গায়ক হিসেবে সদারঙ্গের পরেই অদারঙ্গের নাম উল্লেখ করা হয়।

মধ্যযুগের সংগীতজ্ঞগণের শ্রেণীভেদ

মধ্যযুগের সংগীতবিদ্‌গণ চার প্রকারে শ্রেণীভুক্ত ছিলেন: প্রথমত, কলাবন্ত— যাঁরা ধ্রুপদ গাইতেন ও বীণা বাজাতেন; দ্বিতীয়ত, কাওয়াল— যাঁরা আমীর খসরু-প্রবর্তিত রীতি অনুসারে কাওয়ালি গান গাইতেন; তৃতীয়ত, মিরাসি— যাঁরা পেশাগতভাবে ভজন গান গাইতেন, এবং চতুর্থত, ধাড়ী— যাঁরা প্রাচীন বংশানুক্রমে পেশাগতভাবে গানবাজনা করতেন— তাঁরা কর্ফা নামে একপ্রকার গান গাইতেন যার মধ্যে কিছু উচ্চাঙ্গ

সংগীত ও কিছু পল্লীসংগীতের মিশ্রণ ছিল। বর্তমানে বড়ো বড়ো ওস্তাদের অধিকাংশই ধাড়ীসম্প্রদায়-উদ্ভূত। ধাড়ীরা ওস্তাদদের সঙ্গে সারেংগী বাজিয়ে সংগীত শিক্ষা করতেন। মিরাসি সম্প্রদায়ও ধাড়ীদের মতো বর্তমান যুগে বড়ো বড়ো ওস্তাদের সম্প্রদায় হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। ধাড়ী ও মিরাসিগণ গায়িকা ও নর্তকীদের সঙ্গে সংগত করতেন।

আধুনিক যুগ

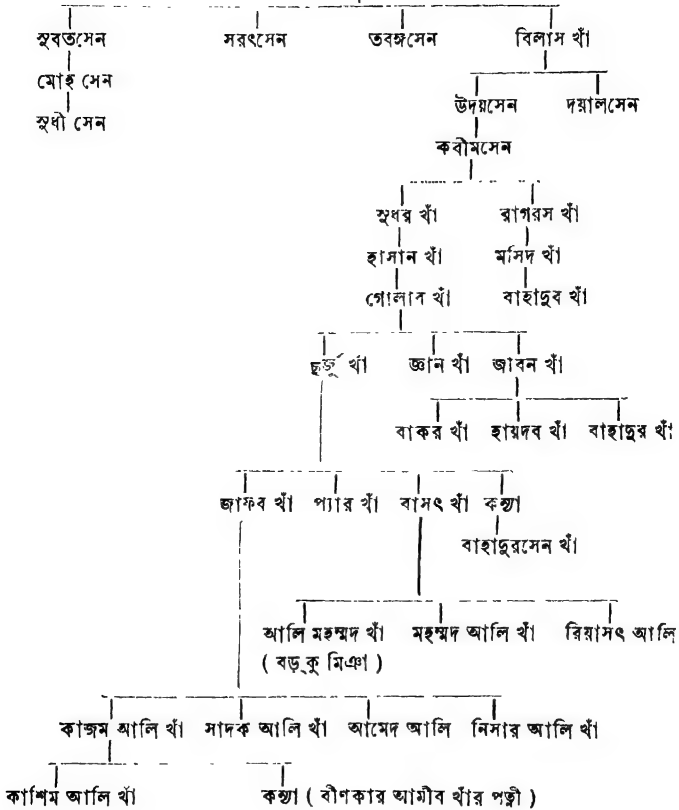
পূর্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে মধ্যযুগে দিল্লির বাদশাহদের আনকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লির দরবারে বিশেষ বিশেষ সংগীতগুণীজ্ঞানীগণের অভূতপূর্ব সমাবেশ হয়েছিল এবং হিন্দুস্থানী সংগীতের বিশেষতঃ হিন্দুস্থানী সংগীতের ক্রিয়াত্মক দিকের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। বাদশাহ মহম্মদ শার মৃত্যুর পর দিল্লির সাম্রাজ্যিক ভিত্তি ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে এবং গুণীগণের পৃষ্ঠপোষকতার বাঁধুনিও তার ফলে শিথিল হতে থাকে। অবশেষে শাহ আলমের রাজত্বকালে দিল্লির গুণীসভায় ভাঙন ধরে এবং গুণীগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তানসেনের বংশধরগণ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে ও তানসেনের শিষ্যবংশীয়গণ রাজপুতনাদি অঞ্চলে গমন করেন। সে-সব অঞ্চলের সংগীতরসিক নৃপতি ও নবাবগণ পরম আগ্রহে এই সব গুণীগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তার মধ্যে তানসেনের পুত্রবংশীয় ও দৌহিত্রবংশীয় গুণীগণের পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গে বারানসী, বেতিয়া ও রেবার রাজা এবং অযোধ্যার নবাবের নাম উল্লেখযোগ্য।

তানসেন হিন্দুস্থানী সংগীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে-ছিলেন। তানসেনের পুত্র ও কন্যা -বংশীয় গুণীগণের ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে এই প্রভাব আরো ব্যাপক

হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সেনী ঘরানার প্রভাব আজও ব্যাপক-ভাবে বর্তমান। সেজন্য সেনী ঘরানার বিভিন্ন গুণীগণের পরিচয় পেলে হিন্দুস্থানী সংগীতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের মুলসূত্র ধরার সুবিধে হবে। তদুদ্দেশ্যে পরবর্তী আলোচনা পরিস্ফুট করার জন্য এ স্থলে তানসেনের বংশলতিকা সংকলন করা হল। বলা আবশ্যক যে উক্ত তালিকা ও তালিকাসূত্রে পরবর্তী আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের কলেবর অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত হবে।

তানসেন

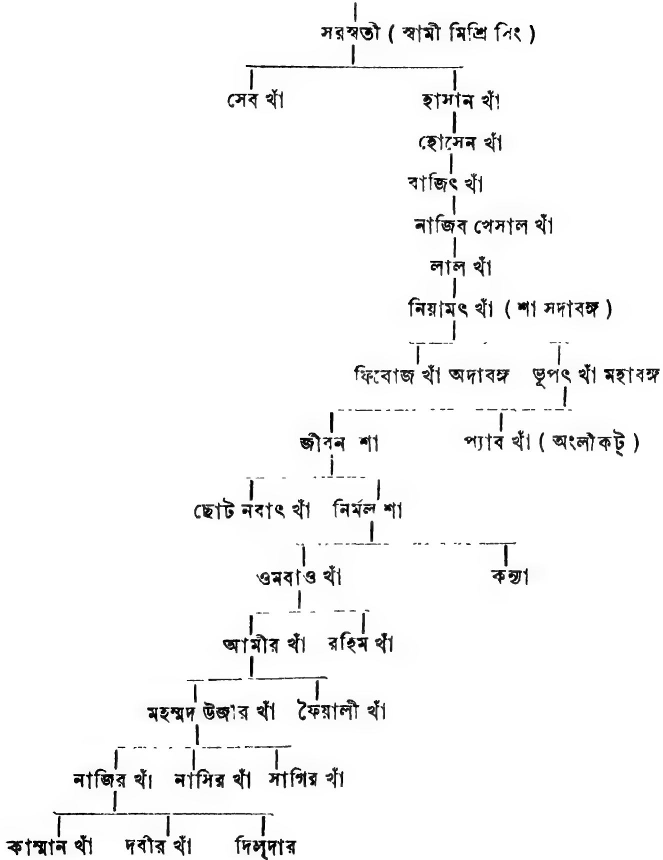
(পুত্রবংশ)



সুরতসেন
সরৎসেন
তরঙ্গসেন
বিলাস খাঁ
মোহ সেন
সুধী সেন
উদয়সেন
দয়ালসেন
কবীমসেন
সুধর খাঁ
রাগরস খাঁ
হাসান খাঁ
মসিদ খাঁ
গোলাব খাঁ
বাহাদুর খাঁ
ছজ্জু খাঁ
জ্ঞান খাঁ
জাবন খাঁ
বাকর খাঁ
হায়দর খাঁ
বাহাদুর খাঁ
জাফর খাঁ
প্যার খাঁ
বাসৎ খাঁ
কন্যা
বাহাদুরসেন খাঁ
আলি মহম্মদ খাঁ
(বড়কু মিঞা)
মহম্মদ আলি খাঁ
রিয়াসৎ আলি
কাজম আলি খাঁ
সাদক আলি খাঁ
আমেদ আলি
নিসার আলি খাঁ
কাশিম আলি খাঁ
কন্যা (বীণকার আমীর খাঁর পত্নী)

তানসেন

(কন্যাবংশ)



সরস্বতী (স্বামী মিশ্রি সিং)
সেব খাঁ
হাসান খাঁ
হোসেন খাঁ
বাজিৎ খাঁ
নাজিব পেসাল খাঁ
লাল খাঁ
নিয়ামৎ খাঁ (শা সদাবঙ্গ)
ফিরোজ খাঁ অদাবঙ্গ
ভূপৎ খাঁ মহাবঙ্গ
জীবন শা
প্যাব খাঁ (অংলীকট্)
ছোট নবাৎ খাঁ
নির্মল শা
ওমরাও খাঁ
কন্যা
আমীর খাঁ
রহিম খাঁ
মহম্মদ উজীর খাঁ
ফৈয়ালী খাঁ
নাজির খাঁ
নাসির খাঁ
সাগির খাঁ
কাম্মান খাঁ
দবীর খাঁ
দিলদার

আলোচনার সুবিধার্থে যে-তালিকা সংকলন করা হল বলা বাহুল্য যে তার অন্তর্ভুক্ত সব গুণী আধুনিক যুগের আওতায় পড়ে না। তানসেন প্রভৃতি গুণীগণ সম্পর্কে মধ্যযুগ পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তানসেনের পুত্রবংশীয় গুণীগণ গৌড়ীয় বাণীতে বিশেষ কুশলী ছিলেন। তাঁদের গায়ন-বাদনে প্রধানতঃ সরলতা ও রাগরূপের পরিস্ফুটতারই পরিচয় পাওয়া যেত। আর-একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। তানসেন এবং বিলাস খাঁ এবং তাঁর পুত্রবংশের অধস্তন কয়েক পুরুষের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় যে তাঁদের জীবনে সংগীতসাধনার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার একটি ধারাও ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। বিলাস খাঁর পৌত্র করীমসেনের দুই পুত্র সুধর খাঁ ও রাগরস খাঁ। রাগরস খাঁর পুত্র গুণী মসিদ খাঁ মসিদখানি বাজনার স্রষ্টা। সুধর খাঁর পুত্র হাসান খাঁকে 'সফেদ্ দেও' (শুভ্রদেবতা) বলা হত— তাঁর সরল অন্তঃকরণ ও শুভ্রকান্তির জন্য। হাসান খাঁ ও তৎপুত্র গোলাব খাঁ উত্তম ধ্রুপদগায়ক ছিলেন। গোলাব খাঁর তিন পুত্র **ছজু খাঁ, জ্ঞান খাঁ** ও **জীবন খাঁ**-র মধ্যে ছজু খাঁ রবাব যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ ছিলেন ধ্রুপদী। ছজু খাঁর তিন পুত্র— **জাফর খাঁ, প্যার খাঁ** ও **বাসৎ খাঁ**। জ্ঞান খাঁর কোনো সন্তান ছিল না। জীবন খাঁর পুত্রগণের মধ্যে বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) রাজা -কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। তাঁর অনেক বাঙালী শিষ্য ও শিষ্যপরম্পরা

পরবর্তীকালে দেশবিখ্যাত হয়েছিলেন।

হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসে পূর্বোল্লিখিত জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিন ভ্রাতা সংগীতসাধনার উচ্চ মার্গে গমনের অধিকারী হয়েছিলেন। গীত, বাদ্য, শৈলী ও সাধনায় তাঁদের স্থান তৎকালে সকলের শীর্ষে ছিল। জাফর খাঁ ও প্যার খাঁর পিতা ছজু খাঁর নিকটে সংগীতবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, আর বাসৎ খাঁ শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁর পিতৃব্য জ্ঞান খাঁর নিকটে। জ্ঞান খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন বলে ভ্রাতুষ্পুত্র বাসৎ খাঁকেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং অতি যত্নে তাঁকে পালন করেছিলেন। সংগীতবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাসৎ খাঁকে তিনি যোগসাধনাও শিক্ষা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া এই তিন ভ্রাতা তানসেনের কন্যা-বংশীয় সংগীতগুণী নির্মল শা বীণকারের স্নেহ ও শিক্ষা লাভেও ধন্য হয়েছিলেন।

জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ॥ জাফর খাঁ যন্ত্রসংগীতে সিদ্ধ ছিলেন। কঠোর সাধনায় তিনি 'রবাবী' যন্ত্রসংগীত পদ্ধতিকে শীর্ষস্থানে তুলতে পেরেছিলেন। সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের স্রষ্টাও তিনিই। প্যার খাঁও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রই বাজাতেন বেশি। জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ উভয় ভ্রাতাই অনেক সময় রেবাধিপতি বিশ্বনাথ সিংহের সভায় থাকতেন। প্যার খাঁ কেবলমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদক ছিলেন না, তিনি একজন উচ্চস্তরের স্রষ্টাও ছিলেন। তিলককামোদ রাগ প্যার খাঁরই সৃষ্টি। একটি

গ্রাম্য সুর থেকে তিনি এই রাগের উপাদান আহরণ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

বাসৎ খাঁ ॥ জাফর খাঁ ও প্যার খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসৎ খাঁর জন্ম আনুমানিক ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে। সংগীতে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা পিতৃব্য অপুত্রক জ্ঞান খাঁর নিকটে। জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ সংগীতবিদ্যায় অসাধারণ শিক্ষা ও পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাসৎ খাঁর শিক্ষা আরো সর্বতোমুখী ছিল। বাসৎ খাঁ শুধু গীতবাদ্য তথা সংগীতবিদ্যায় নয়, সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র ও পার্শী ভাষায়ও বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। ফকীর জ্ঞান খাঁর প্রভাবে আবাল্য মানুষ হওয়ায় বাসৎ খাঁর অন্তরে ধর্মভাবের বিকাশ হয়েছিল। বাসৎ খাঁর রবাবের হাত যেমন সুমিষ্ট ছিল, কণ্ঠও ছিল তেমনি সুমধুর। দৈবদুর্বিপাকে তাঁর হাত পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় যৌবনেই তাঁকে রবার-বাদন ছেড়ে দিতে হয়, কিন্তু আজীবন তিনি তাঁর কণ্ঠসংগীতসুধা পবিবেশন করে গেছেন।

লক্ষ্ণৌ দরবার ভেঙে যাওয়ার পর বাসৎ খাঁ কলকাতায় এসে বৎসরাধিক কাল মেটিয়াবুরুজে ওয়াজেদ আলি শার দরবারে ছিলেন। রাজা হরকুমার ঠাকুর তাঁর কাছে রবাব ও সেতার শিক্ষা করেন এবং তাঁকে এক বিশেষ গুণীসভায় 'সংগীতনায়ক' উপাধিতে ভূষিত করেন। বাসৎ খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জাফর খাঁর পৌত্র কাশিম আলি খাঁও বাসৎ খাঁর নিকটে রবাবের তালিম ভালোভাবেই নিয়েছিলেন। বাসৎ খাঁ যথার্থ সংগীতানুরাগীগণকে

প্রাণ খুলে শিক্ষা দিতেন— কোনো কপটতা বা কার্পণ্য তাঁর ছিল না। বাংলা দেশে বৎসরাধিক কাল অবস্থিতির পর তিনি গয়ার নিকটবর্তী টিকারি রাজ্যের অধিপতির আমন্ত্রণে তথায় গমন করেন এবং তাঁর শেষজীবন গয়াতেই অতিবাহিত হয়। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে বাসৎ খাঁ পরলোকগমন করেন।

তানসেনের কন্যাবংশীয় নিয়ামৎ খাঁর (শা সদারঙ্গ) কনিষ্ঠ পুত্র ভূপৎ খাঁর (মহারঙ্গ) দুই পুত্র— জীবন শা ও প্যার খাঁ (অংলীকট্)। জীবন শার দুই পুত্র— রসবীন খাঁ ও নির্মল শা বীণকার হিসাবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রসবীণ খাঁ বীণা এত ভালো বাজাতেন যে তাঁকে ছোট নবাৎ খাঁ বলা হত এবং কেউ কেউ আদর করে তাঁকে 'রঙ্গারঙ্গ' বলতেন। নির্মল শাও খুব উঁচু দরের গুণী ছিলেন এবং অযোধ্যার নবাব-কর্তৃক 'শাহ্' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সংগীতবিদ্যার প্রসারকর্মে নির্মল শা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যসংখ্যাও অনেক। নির্মল শার পুত্র ওমরাও খাঁ উত্তম বীণাশিল্পী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র আমীর খাঁ ও রহিম খাঁও বীণকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমীর খাঁর দুই পুত্র— মহম্মদ উজির খাঁ ও ফৈয়ালী খাঁ। তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ উজীর খাঁ সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ উজীর খাঁর সঙ্গে তৎকালীন একটি বৃহৎ সাংগীতিক পরিমণ্ডল সংশ্লিষ্ট।

উজীর খাঁ

সংগীতনায়ক উজীর খাঁ আনুমানিক ১৮৬০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁর পিতা আমীর খাঁ বীণকার রামপুরে নবাব কাল্বে আলি খাঁর দরবারে ছিলেন। বিখ্যাত সুরশৃঙ্গার-বাদক বাহাতুর সেন খাঁও সেখানেই অবস্থিত ছিলেন। অতি বাল্যবয়সেই কণ্ঠসংগীতে ও যন্ত্রসংগীতে উজীর খাঁর বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। সাত-আট বৎসর বয়স থেকেই তিনি পিতার নিকট ধ্রুপদ ও বীণা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর মাতামহ বাহাতুরসেন নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনিও অপত্যনির্বিশেষে উজীর খাঁকে ধ্রুপদ ও রবাব শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। ফলে কৈশোরকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই খাঁ সাহেব বীণা, সুরশৃঙ্গার, রবাব ও ধ্রুপদে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উজীর খাঁর শিক্ষা বিষয়ে বাহাতুরসেন ও আমীর খাঁর মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। উভয়েরই বাসনা ছিল যে উজীর খাঁর দ্বারা তাঁদের কীর্তি ও সুনাম বজায় থাকবে। ফলে কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সংগীতে খাঁ সাহেব অশেষ গুণের অধিকারী হন।

উজীর খাঁ কৈশোরেই মাতামহ ও পিতা উভয়কেই হারালেন। নবাব কাল্বে আলি খাঁর জীবদ্দশায় তিনি তাঁরই দরবারে প্রতিপালিত হন। কাল্বে আলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হায়দর আলি খাঁ উজীর খাঁকে বিল্‌সিতে নিয়ে গেলেন ও সেখানে ছয় বৎসরকাল রাখলেন। ওই সময়ে হায়দর আলি খাঁর উদ্যোগে তাঁরই ঘনিষ্ঠ নবাববংশীয় কোনো আত্মীয়ার সঙ্গে

উজীর খাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর খাঁ সাহেব নবাব সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক দেশভ্রমণে বের হন। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বৎসর।

রামপুর ও বিল্‌সিতে অবস্থানকালে উজীর খাঁ শুধু সংগীতই অভ্যাস করেন নি, উপযুক্ত পণ্ডিতের নিকট সংগীতশাস্ত্র, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ, হিন্দী আরবী পার্শী ও কিছু ইংরাজিও শিক্ষা করে বহুমুখী বিদ্যার অধিকারী হয়েছিলেন। পুরাণ অবলম্বনে নাটক ও কবিতাদি হিন্দি ভাষায় রচনা করা তাঁর অবসরবিনোদনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তা ছাড়া চিত্রাঙ্কনেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

উজীর খাঁর অপর মাতামহদ্বয় সাদেক আলি খাঁ ও নিসার আলি খাঁ তৎকালে বারানসীতে কাশীনরেশের রাজসভায় ছিলেন। উজীর খাঁ অতঃপর কাশীধামে গমন করেন ও তাঁদের নিকটে কিছুকাল অবস্থান করেন। সাদেক আলি খাঁর মৃত্যুর পর নিসার আলি খাঁ কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি রবাববংশীয় সকল গুপ্তবিদ্যা ও বাহাদুর সেনেরও অজ্ঞাত অনেক ধ্রুপদ উজীর খাঁকে দান করেন। নিসার আলির মৃত্যুর পর উজীর খাঁ কাশী পরিত্যাগ করে কলকাতায় আসেন ও কলকাতাতেই বসবাস করতে আরম্ভ করেন। কাশীতে পরে যখন মহম্মদ খাঁ সাহেব রাজগুরু হন তখন উজীর খাঁ মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতেন।

উজীর খাঁ কলকাতায় প্রায় সাত আট বৎসর ছিলেন। প্রতি

বৎসর কিছুকালের জন্য দেশভ্রমণ করায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। মাতুল কাশিম আলি খাঁর নিমন্ত্রণে ত্রিপুরার রাজদরবারে গিয়ে তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন। দ্বারভাঙা রাজ-দরবার, ইন্দোর-দরবার, হায়দরাবাদের নিজাম-দরবার ও মাদ্রাজ নগরীতে নিমন্ত্রিত হিসাবে গিয়ে খাঁ সাহেব অসামান্য গুণপণা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতায় মেটিয়াবুরুজের নবাবগণ, পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা তুনী শীল, তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, পঞ্চেৎগড়ের জমিদার প্রভৃতি গুণীগণ খাঁ সাহেবের বিশেষ অনুরাগী ও ভক্ত ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালে উজীর খাঁ বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। বাংলা কথা তিনি উত্তমরূপেই বলতে পারতেন।

কলকাতায় কয়েক বৎসর যাপনের পর উজীর খাঁ রামপুরের নবাব হামিদ আলি খাঁর সংগীতগুরুর পদে অভিষিক্ত হয়ে তথায় গমন করেন। নবাব উজীর খাঁর নিকট উত্তমরূপে বীণা ও হোরি-ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন, এবং খাঁ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিস্তর জমিদারি লিখে দিয়েছিলেন। নবাব খাঁ সাহেবসহ মাঝে মাঝে দিল্লি বোম্বাই মুসৌরী ইত্যাদি নগরে ভ্রমণে যেতেন, কিন্তু রামপুরে যাবার পর আর কলকাতায় আসার সুযোগ খাঁ সাহেবের ঘটে ওঠে নি।

রামপুরে উজীর খাঁ সংগীতের নানা বিভাগে বহু শিষ্য তৈরি করেছিলেন। নবাবদরবারে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান অমাত্য ও নবাব-পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ছাড়াও খাঁ সাহেবের অন্যান্য

শিষ্যদের মধ্যে পঞ্চেৎগড়ের জমিদার যাদবেন্দ্রবাবু, সেতার ও সুরবাহার -বাদক নসির আলি, বীণকার মহম্মদ হোসেন, সেতারী আবদর রহিম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই খাঁ সাহেবের যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের শিষ্য। তারপরে স্বরোদী হাফেজ আলি খাঁ ও বঙ্গগৌরব আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর খ্যাতি ও কীর্তির যথেষ্ট প্রসার করেছেন। এ সকলের মধ্যে উজীর খাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যের নাম বলতে হলে আলাউদ্দীন খাঁর নামই করতে হয়।

উজীর খাঁর তিন পুত্র— নাজির খাঁ বা প্যারে মিঞা, নাসির খাঁ ও সগীর খাঁ। এঁরা সকলেই পিতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার অধিকারী হয়েছিলেন। তার মধ্যে প্যারে মিঞা পিতার নিকট বহুবৎসর সংগীতশিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতিভাও পিতারই তুল্য ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ কলেরার আক্রমণে প্যারে মিঞা অকালে কালের করালগ্রাসে পতিত হলে উজীর খাঁ অত্যন্ত মানসিক আঘাত পান। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যাতে তাঁর বংশগত অমূল্য সম্পদ আপন বংশে উপযুক্ত আধারে রক্ষিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র সগীর খাঁ ও পৌত্র দবীর খাঁ তাঁর গুণাবলীর উপযুক্ত অধিকারী হয়েছেন। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে উজীর খাঁ পরলোকগমন করেন।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে হিন্দুস্থানী সংগীতের তৎকালীন পরিমণ্ডল ও তার সংশ্লিষ্টতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হওয়া সম্ভব।

কাশী, গোয়ালিয়র, রামপুর ইত্যাদি স্থান তো সাংগীতিক চর্চা ও পরিবেশের কেন্দ্রই ছিল। এ দিক থেকে একসময়ে জয়পুরের সুনামও বড়ো কম ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জয়পুরের দরবারে বিশিষ্ট সংগীতগুণী ছিলেন ষট্‌শাস্ত্রী বৈরাম খাঁ। তিনি কর্ণাটক পণ্ডিতের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। মূলতঃ জয়পুরের ঘরানা হল সুরতসেনের ঘরানা। বৈরাম খাঁর নাতি জাকিরুদ্দিন আলাবন্দে নতুন স্টাইলে ধ্রুপদ প্রবর্তন করেন। তাঁর ধ্রুপদ ছিল সংস্কৃতঘেঁষা। ধ্রুপদচর্চার দিক থেকে বাংলা-দেশের বিষ্ণুপুরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুপুর ॥ কথিত আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের রাজার আমন্ত্রণে বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে আসেন। উক্ত বাহাদুর খাঁ জীবন খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। বিষ্ণুপুরে বাহাদুর খাঁর অবস্থান ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে সেখানে ধ্রুপদচর্চার প্রসারের সহায়তা হয়। এই ঘরানার আদি ও বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ হিসাবে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামশঙ্করের শিষ্যগণের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদু ভট্ট), অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতজ্ঞগণ স্বনামধন্য হয়েছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

ওয়াজেদ আলি শা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ওয়াজেদ আলি শা ছিলেন লক্ষ্ণৌর নবাব। তিনি সংগীতজ্ঞ, গুণগ্রাহী ও সুলেখক ছিলেন। লক্ষ্ণৌ দরবারের সঙ্গে তানসেনবংশীর গুণীগণের যোগাযোগ ছিল। ওয়াজেদ আলি শার লক্ষ্ণৌ-দরবারে অনেক গুণীর সমাবেশ হয়েছিল। তানসেনের পুত্রবংশীয় ছজু খাঁর তিন পুত্র জাফর খাঁ প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁকেও তিনি এই দরবারে আহ্বান করে আনেন। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে ওয়াজেদ আলি শাকে বাংলাদেশের মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করেন এবং তাঁর ব্যয়নির্বাহের জন্য বৎসরে বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন। মেটিয়াবুরুজেও ওয়াজেদ আলি শা একটি গুণীসমাবেশের সৃষ্টি করেন এবং তার ফলে তৎকালে বাংলাদেশে একটি বিশেষ সাংগীতিক পরিমণ্ডলের পত্তন হয়। এই গুণীসমাবেশের সংশ্লিষ্টতায় বাসৎ খাঁ (ধ্রুপদী। পরে গয়া চলে যান), বাসৎ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আলি মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিঞা), তাজ খাঁ (ধ্রুপদী। পরে নেপালে চলে যান), কাশেম আলি খাঁ (রবাবী। পরে নেপালে চলে যান), আহমেদ খাঁ (খেয়ালী), আলি বক্স (ধ্রুপদী) প্রভৃতি গুণীগণের নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থানী সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ের বিখ্যাত গুণীগণ এই সমাবেশে স্থান পেয়েছিলেন।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীতধারার সূচনায় রামশঙ্কর ভট্টাচার্য এক বিশেষ আসন অধিকার করেছিলেন। বিষ্ণুপুরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সম্ভবত ১৭৬১ খৃস্টাব্দে রামশঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গদাধর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তরুণ বয়সেই রামশঙ্করের সংগীত-প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। তাঁর সংগীতশিক্ষার সূত্রপাত হয় একজন পশ্চিম ভারতীয় গুণী গায়কের নিকটে। কেউ কেউ রামশঙ্করকে বাহাদুর খাঁর শিষ্য গদাধর চক্রবর্তীর শিষ্যস্থানীয় বলে থাকেন। কিন্তু এ তথ্যের যুক্তিবহতা কম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সেনী ঘরানার ধ্রুপদরীতিই হোক বা পশ্চিম-ভারতীয় ধ্রুপদরীতিই হোক তার মূল-উৎস গোয়ালিয়ররীতি যার প্রবর্তক ছিলেন রাজা মান। রামশঙ্কর একাধারে সংগীতজ্ঞ ও সংগীতরচয়িতা ছিলেন— তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদগায়ক ও ধ্রুপদরচয়িতা। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁর রচিত ধ্রুপদ আছে। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য পরলোকগমন করেন।

বাংলাদেশে ধ্রুপদ গানের মূল-ঘরানা হল বিষ্ণুপুর-ঘরানা। এই ঘরানার আদি ও প্রধান ধারক রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, এবং এই ঘরানার গীতরীতি রামশঙ্করের শিষ্যপরম্পরাক্রমেই বর্তমানকাল পর্যন্ত বাহিত হয়ে আসছে।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮২৩?) মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদেব রাধাকান্ত গোস্বামী বাল্যবয়স থেকে তাঁর পুত্র ক্ষেত্রমোহনের সংগীতানুরাগ লক্ষ্য করে বিষ্ণুপুরে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের নিকট তার সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ক্ষেত্র-মোহন দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করে সংগীতবিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন।

তারপর তিনি জীবিকার্জনের আশায় কলিকাতায় আসেন। পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তিনি সেখানকার সভাগায়ক নিযুক্ত হন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। পাথুরিয়াঘাটায় থাকা-কালেই ক্ষেত্রমোহনের সংগীতপ্রতিভা নানাভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং তিনি বহুবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এই সময়েই তিনি বারাণসীর বিখ্যাত বীণকার ও ধ্রুপদী লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের নিকট প্রধানত যন্ত্রসংগীতে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পান।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বাংলা হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় অনেক ধ্রুপদ রচনা করেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় তিনি বাংলা দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন এবং ওই পদ্ধতিতে কতিপয় স্বরলিপি-গ্রন্থ রচনা করেন। **কণ্ঠকৌমুদী, সংগীতসার,**

গীতগোবিন্দের স্বরলিপি ইত্যাদি ক্ষেত্রমোহন-কৃত উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থাবলী। ঐকতান-বাদ্য (অর্কেস্ট্রা) গঠনেও ক্ষেত্রমোহন এ দেশে পথিকৃৎ। বেঙ্গল অ্যাকডেমি অফ মিউজিক তাঁকে 'সংগীতনায়ক' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীতক্ষেত্রে বিশেষ যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী পরলোক-গমন করেন।

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কৃতী ও প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে অনন্ত-লাল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম এবং কথিত আছে, সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অনন্তলালের পিতৃদেব গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। পুত্রকেও তিনি প্রথমে ব্যাকরণ ও পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে প্রবৃত্ত করেন। এই সময়ে অনন্তলালের মনে সংগীতপ্রেমের উন্মেষ হয় এবং রামশঙ্করের সার্থক শিক্ষায় ও নির্দেশনায় সংগীতের ক্রমোচ্চ সোপানে আরোহণ করেন ও বিশিষ্ট সংগীতবিদ্‌ হিসাবে স্বনামধন্য হন।

অনন্তলাল নিরহঙ্কারী সচ্চরিত্র ও সংগীতশিক্ষাদানে অকৃপণ ব্যক্তি ছিলেন। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা অনন্তলালের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁকে 'সংগীতকেশরী' উপাধিতে

ভূষিত করেছিলেন। অনন্তলালের শিষ্যগণের মধ্যে রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বিশেষ যশস্বী হয়েছিলেন। অনন্তলালের জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও কৃতবিদ্য ও বহুমুখী সংগীতগুণী ছিলেন।

যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদু ভট্ট)

যদুনাথ ভট্টাচার্য যদু ভট্ট নামেই অধিক পরিচিত। বিষ্ণুপুরে ১৮৪০ খৃস্টাব্দে যদু ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মধু ভট্টাচার্য। যদু ভট্টের সহজাত সংগীতগুণ ছিল। তিনি রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কৈশোর বয়সেই রামশঙ্করের দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে। তার পর যদু ভট্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগীতকেন্দ্রিক অঞ্চলে গমন করেন ও নানা সংগীতকলাকারের সংশ্লিষ্টতায় তাঁর সংগীত প্রতিভার স্ফুরণ হয়। তাঁর সংগীতযশব্যাপ্তির ফলে বিভিন্ন রাজসভা থেকে আহ্বান আসে এবং তিনি বিভিন্ন রাজসভায় সংগীতাচার্যরূপে অবস্থিতি করেন। পঞ্চকোটের রাজা যদু ভট্টকে 'রঙ্গনাথ' উপাধিতে ও ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর 'তানরাজ' উপাধিতে অলংকৃত করেছিলেন। তিনি কিছুকাল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যদু ভট্টের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-স্মৃতিতে যদু ভট্টের সংশ্লিষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়।

যদু ভট্টের যশ ধ্রুপদী হিসাবেই যদিও অধিক ব্যাপ্ত

হয়েছিল, কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের বিভিন্ন বিষয়ে, যথা সুরবাহার, সেতার, মৃদঙ্গ ইত্যাদিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর জীবন-কাল দীর্ঘ নয়, তবুও ওই সময়ের মধ্যেই তিনি সংগীতকলাবিদ্ হিসাবে ভারতখ্যাত হয়েছিলেন।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

বিষ্ণুপুরে ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর জন্ম হয়। বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক জগৎচাঁদ গোস্বামী তাঁর পিতা। রাধিকাপ্রসাদের প্রথম জীবনে সংগীত গুরু দু জন— যদু ভট্ট ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁদের কাছে দীর্ঘকাল সংগীতশিক্ষার সুযোগ তাঁর হয় নি। তাঁদের সাহচর্যে এসে রাধিকাপ্রসাদের মনে সংগীতশিক্ষার যে স্পৃহা জাগ্রত হয়েছিল তা পূরণ করবার মানসে তিনি কলকাতায় আসেন ও বেতিয়া ঘরানার বিখ্যাত ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট দীর্ঘকাল উত্তমরূপে ধ্রুপদের তালিম নেন। শেষোক্ত গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট কিছু খেয়ালও শিক্ষা করেন। তার পর রাধিকাপ্রসাদের সংগীতযশ ক্রমশঃ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে এবং বাইরেও ক্ল্যাসিকাল সংগীতের ক্ষেত্রে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নাম সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর পূর্ণ যশসৌরভের অন্য কারণও আছে। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তনে একদিকে যেমন সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তন

ঘটেছিল অন্যদিকে সংগীতের পরিমণ্ডলেও রূপান্তরের সূচনা হয়েছিল। সমষ্টিগত প্রার্থনায় সংগীত হল অপরিহার্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে রাধিকাপ্রসাদ সংগীতাচার্যরূপে কয়েক বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজের সেবা করেন। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

জীবনের শেষাংশে রাধিকাপ্রসাদ কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুরোধে কয়েক বৎসর বহরমপুরে ও পরে কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে অবস্থান করেন। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে বিষ্ণুপুরে রাধিকাপ্রসাদ পরলোকগমন করেন।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

১৮৪০ খৃস্টাব্দে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর। শৌরীন্দ্রমোহন সাহিত্য ও সংগীত উভয় বিষয়েই কুশলী ছিলেন। তবে সংগীতজ্ঞ হিসাবেই তাঁর পরিচিতি অধিক।

শৌরীন্দ্রমোহন দীর্ঘকাল আলি মহম্মদ খাঁর নিকট সংগীত শিক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তম ধ্রুপদী ও সেতারী। বাস্তবিকপক্ষে শৌরীন্দ্রমোহনের ন্যায় সংগীতজ্ঞ, সংগীতপ্রেমী, সংগীতোৎসাহী ও পৃষ্ঠপোষকের তুলনা মেলে কম। তিনি স্বয়ং এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সহায়তায় উল্লেখযোগ্য

সংগীতকর্ম করে গিয়েছেন। শৌরীন্দ্রমোহন-কৃত Universal History of Music, যন্ত্রকোষ ইত্যাদি সংগীত-গ্রন্থাবলীতে তাঁর জ্ঞানপরিধির বিস্তৃতি ও সংগ্রহ-প্রাচুর্যের প্রমাণ স্পষ্ট। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে তাঁর দেহান্তর ঘটে।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে। তিনি উচ্চ-শিক্ষিত ও যথার্থ সংগীতপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর প্রাণে সংগীতানুরাগ এত প্রবল ছিল যে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করে সংগীতসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং আর্থিক কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করেও হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসে মহৎ কীর্তি সম্পাদন করেন।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীত-বিষয়ে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে তাঁর **গীতসূত্রসার** গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসে একটি অতিশয় মূল্যবান সংযোজন। যে পরিশ্রম সহকারে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন তার তুলনা মেলে কম। তা ছাড়া, উক্ত গ্রন্থে কৃষ্ণধনের পাণ্ডিত্য, বিচারক্ষমতা, দূরদৃষ্টি ও উদার মনের পরিচয় স্পষ্ট। গীতসূত্রসার গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো কোনো বিষয়ে আজও গবেষণা ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন আছে।

১৯০৪ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ১৮৬০ খৃস্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত-বিষয়েও তাঁর প্রবল অনুরাগ ও বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। তাঁর পিতামাতাও তৎসম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতেন। পরিণত বয়সে একদিকে তিনি যেমন বি. এ. ও এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, অন্য দিকে নানা সংগীতগুণীর শিক্ষায় ও সাহচর্যে সংগীত-বিষয়েও বিশেষ কুশলতা অর্জন করেন। কর্মজীবনে আইন-ব্যবসায় তাঁর উপজীব্য হলেও সংগীতকর্মেই তিনি অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। এজন্য তিনি মরাঠী ও ইংরেজি ভাষা ছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দি, তেলেগু, গুজরাটী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করেছিলেন।

আধুনিক যুগের উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভারতখণ্ডে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। 'চতুর পণ্ডিত' নামে খ্যাত এই কুশলী সংগীতজ্ঞ ভারতবর্ষের বহু সংগীতসমৃদ্ধ অঞ্চল পরিভ্রমণ করে অতিশয় পরিশ্রম সহকারে সংগীতের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি দিল্লি, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, গয়া, কাশী, মথুরা, জয়পুর, যোধপুর ইত্যাদি অঞ্চল পর্যটনকালে ধ্রুপদ-খেয়ালাদি শিক্ষাসূত্রে ও আলোচনাক্রমে তথ্যাদি সংগ্রহকার্যে তৎকালীন বহু বিখ্যাত ওস্তাদগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তিনি কলকাতায়

আসেন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে ও তাঁর যোগসূত্রে এতদঞ্চলের সংগীতগুণীগণের নিকট থেকে সংগীত-তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে -কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতের ক্রিয়াত্মক সংগীতের লিপি -সম্বলিত **ক্রমিক পুস্তকমালিকা** ছয় খণ্ড ও হিন্দুস্থানী সংগীতের তত্ত্বমূলক **হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি** চার খণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মূল্যবান গ্রন্থাবলী রচনার দ্বারা একদিকে তিনি যেমন ওস্তাদমুষ্টি থেকে সংগীতকে মুক্ত করে সর্বসাধারণের জন্য সুরসংরক্ষণ বিষয়ে প্রশংসনীয় কর্ম সম্পাদন করেছেন, অন্য দিকে তেমনি সংগীত-তত্ত্বমূলক বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ, গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বরোদার মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১৫-১৬ খৃস্টাব্দে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেই প্রথম সর্বভারতীয় সংগীতসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। কেবলমাত্র ক্রিয়াত্মক সংগীত পরিবেশনই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল না। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সংগীত-বিষয়ে আহরিত ও সিদ্ধান্তকৃত বিষয়ের আলোচনা এবং মীমাংসিতব্য বিষয়ের উপস্থাপনা। আজকালকার সংগীতসম্মেলনের দারুণ সংখ্যাধিক্যের দিনে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের এই নীতি বিশেষভাবে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে।

১৯৩৬ খৃস্টাব্দে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে পরলোকগমন করেন।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর ১৮৭২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে এক দুর্ঘটনায় তাঁর দৃষ্টিশক্তির হীনতা ঘটে ও তার ফলে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করতে হয়। তারপর তাঁর পিতা মীরাজে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বালকৃষ্ণ বুয়ার নিকট তাঁর সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বিষ্ণুদিগম্বর সেখানে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত নিরলসভাবে সংগীতসাধনা করেন ও সংগীতে বিশেষ কুশলতা অর্জন করেন।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর সাধুপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবন সরল ও অনাড়ম্বর হলেও তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিসচেতন ছিলেন। সংগীত ও সংগীতজ্ঞকে সম্মানজনক আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রতি তাঁর লক্ষ্য ও চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংগীতে প্রচলিত শৃঙ্গাররসাত্মক বাণীর পরিবর্তে ভক্তিরসাত্মক বাণীর রচনা প্রবর্তন করে তিনি সংগীতের প্রচার আরম্ভ করেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর লাহোরে 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' নামে একটি সংগীতশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ভজন গান পরিবেশনের অনবদ্যতা বিষ্ণুদিগম্বরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তুলসীদাস, কবীর, মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক-সাধিকাগণের রচিত ভজন গাইতেন। স্পষ্টতই তিনি রামভক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গানেও রামনামেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর সংগীত-সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ রচনা

করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এক সংগীতলিপি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। সংগীতলিপিকে যথাসম্ভব গীতরূপানুগ করার পক্ষে এই পদ্ধতি অন্যান্য অনেক পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর সহায়ক। কিন্তু মুদ্রণের পক্ষে জটিলতার জন্য উক্ত পদ্ধতি তেমন প্রচলিত হয় নি।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের শিষ্যগণের মধ্যে স্বনামধন্য পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত বিনায়করাও পটবর্ধনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩১ খৃস্টাব্দে মীরাজে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাগ্যগুণে এক-একটি দেশে এমন এক-একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দ্যুতিতে সমাজের সমস্ত স্তরকে উদ্ভাসিত করেন এবং আগামী বহু যুগের আলোক-বর্তিকার জন্য আলোর সঞ্চয় রেখে যান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনই একজন মহাপুরুষ। ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ৭ মে তারিখে কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদাদেবী।

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতরচয়িতা, গায়ক, প্রবন্ধলেখক, সমালোচক, গল্প ও উপন্যাস -স্রষ্টা,

নাট্যকার, অভিনেতা এবং আরো কত কী। একাধারে এই-সব গুণাবলী থেকে বিশ্লিষ্ট করে তাঁর সংগীতজীবন সম্পর্কে আলোচনা করা দুরূহ। বিশেষত তাঁর সাহিত্য থেকে সংগীতকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা চলে না। তবুও বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাঁর সংগীতচিন্তা ও সংগীতকর্ম সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত গান রবীন্দ্রসংগীত নামে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারও কম হয় নি। কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে রবীন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয়েছে কিনা সন্দেহ। সে-বিষয়টি জানতে হলে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার মূল-সূত্রটি ধরবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সংগীত-বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সহজাত প্রতিভা ছিল। ললিতকলার ক্ষেত্রে যথার্থ রসগ্রহণে তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সেই রস যখন তাঁর প্রতিভাস্পর্শে জারিত হয়ে স্বকীয় রূপে অভিব্যক্ত হত অভিনবত্বের ছাপ নিয়ে তাতে বাহুল্য হত বর্জিত। তাঁর পারিবারিক পরিবেশও তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবন-গঠনে প্রধানত পারিবারিক পরিবেশ, মহর্ষির উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং জ্যোতিরিন্দ্র নাথের অভিভাবকত্ব বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। বিশেষত শেষোক্ত কারণটি তিনি নিজে একাধিকবার অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

"তখন আমার বয়স অল্প, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না। তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরলবিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে ; তখন নবযৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে ; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না ; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি— আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই-যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।··· আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ সংগীতগুণী— একাধারে সংগীতশিল্পী, সংগীতশাস্ত্রবিদ্ ও সংগীতে উদারমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। একই ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি গুণের সমাবেশ কদাচিৎ ঘটে। প্রাচীন ভারতে সংগীতের ক্ষেত্রে কলাকার ও শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন একই ব্যক্তি। যিনি গীত বা বাদ্য পরিবেশন করতেন তিনিই সংগীতের তত্ত্ব ও তথ্য -সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করতেন। সেজন্য সংগীতশাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ গায়ন-বাদন ক্রিয়ায় গরমিল ছিল না। কিন্তু মধ্য যুগে বিশেষত তার শেষের দিকে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। তার আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

সংগীতের ক্রিয়া ও তত্ত্ব উভয় বিষয়ের জ্ঞান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক সংগীতচিন্তার সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। বাস্তবিক-পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষার তথ্য, সংগীতসংগ্রহের প্রাচুর্য, সুররক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়াস, আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রচার, লয়নির্দেশের নূতন প্রণালীর উদ্ভাবনা, সংগীত-রচনার ধারা ইত্যাদি তথ্য সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না। তাঁর সাহচর্য রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবন গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

হিন্দুস্থানী সংগীতের আদর্শ ও মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ শ্রদ্ধা, বোধ ও সচেতনতা ছিল। তাঁর নানা বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, তাঁর পত্রাবলীতে বিশেষত শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবীর নিকট লিখিত পত্রগুচ্ছে, ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদিতে তাঁর সংগীতচিন্তার মৌলিকত্ব পরিস্ফুট। তার মধ্যে এ স্থলে প্রসঙ্গত অল্প কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :

১. "আমাদের সংগীত জিনিসটাই ভূমার সুর ; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যেই।"

২. "আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের

দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল।"

৩. "ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়ীতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহা-ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ; তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা তাঁর সংগীতরচনায় কিভাবে কার্যকর হয়েছে তার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। এ স্থলে তার অবতারণা করা উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ হিন্দুস্থানী সংগীতের নানা বিষয়ে, যথা শ্রুতির সার্থকতা, রাগ সংজ্ঞা, রাগরাগিণীর আদর্শ, ঐতিহ্যবাহা ধ্রুপদ, অনুষঙ্গী যন্ত্র, আর্টিস্ট্, তানের

উদ্দেশ্যাদি এবং তুলনামূলকভাবে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ রুচি ও যুক্তিসম্মত মত পোষণ করতেন তাই অধিকতর উল্লেখযোগ্য। তাঁর উক্তি অভ্রান্ত এবং বহু ক্ষেত্রে দিক্‌দর্শনস্বরূপ :

শ্রুতির সার্থকতা

"শ্রুতির আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। এরই যোগে এক সুর কেবল যে আর-এক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগরাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়।"

রাগ-সংজ্ঞা

"রাগ শব্দের গোড়াকার মানে রঙ। এই শব্দটা যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালো লাগা। বাংলায় রাগ কথাটার মানে ক্রোধ। ইংরেজিতে passion বলিতে ভালো লাগা আর ক্রোধ দুইই বোঝায়। ভালো লাগা আর ক্রোধ এই দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই দুটো ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই দুয়েরই এক রঙ, সেই রঙটা রাঙা। ওটা রক্তের রঙ, হৃদয়ের নিজের আভা।"

রাগের শৈলীগত সংজ্ঞা বহু স্থলেই পাওয়া যায়। কিন্তু রাগের ভাবরূপের সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের মতো এত উত্তমরূপে আর-কেউ দিয়েছেন কি না সন্দেহ।

পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, ভৈঁরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে।··· একটাতে সুরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাশ, আর-একটাতে অতি ধীরে ধীরে ক্রমশ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈঁরো ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এই জন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্তিমান।”

ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদ

“আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি : এক দিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর-এক দিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরও বিস্তীর্ণ হোক, আরও বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে

বহুবৈচিত্র্য ঘটুক, তা হলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ব-বিজয়ী হবে।"

অনুষঙ্গী যন্ত্র

"বাংলা দেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন যুগের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয় নি।... দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হত।... সৌভাগ্যক্রমে তখনো আমাদের সংগীতরাজ্যে বক্স্-হারমোনিয়মের মহামারী কলুষিত করে নি হাওয়াকে। তম্বুরার তারে নিজের হাতে সুর বেঁধে সেটাকে কাঁধে হেলিয়ে আলাপের ভূমিকা দিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীতরচয়িতার ধ্রুপদ গানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন।"

আর্টিস্ট্

"আলাপের উপাদানরূপে আছে বিশেষ রাগরাগিণী, সেগুলি গানের সীমার দ্বারা পূর্ব হতেই কোনো রচয়িতার হাতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নি। আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এ স্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই, যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিস্ট্ হিসাবে বলব ধন্য, যিনি পারলেন না, কেবল উপাদানটিকে নিয়ে তুলো ধুনতে লাগলেন, তাঁকে গীতবিদ্যাবিশারদ বলতে পারি কিন্তু আর্টিস্ট্ বলতে পারি নে— অর্থাৎ তাঁকে ওস্তাদ বলতে পারি কিন্তু কালোয়াৎ বলতে পারবো না। কালোয়াৎ

অর্থাৎ কলাবৎ। কলা শব্দের মধ্যে আছে সামাবদ্ধতার তত্ত্ব, সেই সীমা যেটা রূপেরই সীমা।··· জগতে কলাবৎ 'কোটিকে গুটিক মেলে', বলবতের প্রাদুর্ভাব অপরিমিত।"

তানের উদ্দেশ্য

"গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

"গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মুল হইতে বাহির হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মুলের মুল্য বাড়িয়াই উঠে।

"কিন্তু যদি আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উল্টাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক্-না কেন গানকে সে কিছুতেই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।"

য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সংগীত

"য়ুরোপের প্রত্যেক গানে আছে বিশেষ ব্যক্তিত্ব, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক

গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতি-মর্যাদাই প্রকাশ করে। য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করবার জন্যে। য়ুরোপে গান সম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাই দুজনে বখ্‌রা করে নিয়েছে, গানওয়ালা এবং গাহনেওয়ালা। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি হাঁকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড়া হওয়া চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার নাম রাগরাগিণী। সেটা গানকর্তার প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেস্‌পাসের আইন খাটে না।"

সংগীত-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ উক্তিসমূহ পাঠ, অনুধাবন ও বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সংগীতের মৌলিক চিন্তা-ধারার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে প্রথম অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন-ভাষণে এবং তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু বক্তৃতা ও রচনায় তিনি সংগীত-সম্পর্কিত যে-সব পথনির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে অনুসৃত হলে যে হিন্দুস্থানী সংগীতের মান ও মর্যাদার উন্নয়ন হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ৭ অগস্ট তারিখে বহুমুখী প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটে।

নির্ঘণ্ট

অদারঙ্গ ৫৩
অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১
অনুদাত্ত ৫
অনুপবিলাস ৫০
অনুপসংগীতরত্নাকর ৫০
অনুপাঙ্কুশ ৫০
অনুষঙ্গী যন্ত্র ৮৬
অবতারণা ১
অহোবল, পণ্ডিত ৪৮
আকবর ৩৫
আর্চিক ৪
আভিচারিক ৪
আভ্যুদয়িক ৪
আমীর খসরু ২২
আর্টিস্ট্ ৮৬
উজীর খাঁ ৬৩
উদাত্ত ৫
ঋক-প্রতিশাখ্য ৫
ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদ ৮৫
ওড়ব ৫
ওয়াজেদ আলি শা ৬৮
কণ্ঠকৌমুদী ৭০
কবীর ২৯
কলাবন্তী খেয়াল ২৮
কল্লিনাথ ২৭
কাওয়ালি খেয়াল ২৮
কীর্তন ৩২
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫
ক্রমিক পুস্তকমালিকা ৭৭
ক্ল্যাসিকাল গান ৪
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ৭০
খাণ্ডার বাণী ৪২
খেয়ালের উদ্ভাবক ২৩
গাথিক ৫
গীতগোবিন্দ ১৭
গীতগোবিন্দের স্বরলিপি ৭১
গীতসূত্রসার ৭৫
গৌড়ীয় বাণী ৪২
গৌরী ১৪
চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা ৪৯
জনক-জন্য পদ্ধতি ২৬
জয়দেব ১৭
জাতি বা জাতি-রাগ ১১
জাফর খাঁ ৬০

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮১
ডাগর বাণী ৪২
তানসেন ৩৫
তানসেনের কন্যাবংশলতিকা ৫৮
তানসেনের পুত্রবংশলতিকা ৫৭
তানের উদ্দেশ্য ৮৭
তুলসীদাস, মহাকবি ৩৩
দামোদর মিশ্র, পণ্ডিত ৪৭
দীর্ঘ ৬
ধ্রুপদের সৃষ্টি ২৫
নবাৎ খাঁ (মিশ্রি সিং) ৪৫
নাট্যশাস্ত্র ১০
নায়ক গোপাল ২৪
নারদ ৯
নারদ (দ্বিতীয়) ১৫
নারদীয় শিক্ষা ৯
নিয়ামৎ খাঁ (শাহ সদারঙ্গ) ৫০
নৌহার বাণী ৪২
পাণিনিশিক্ষা ৬
পাতঞ্জলসূত্র ৮
পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ৪২
পৌরাণিক যুগ ৮
প্যার খাঁ ৬০
প্রাক্‌-বৈদিক যুগ ১
প্লুত ৬
বাবা রামদাস ও সুরদাস ৩১
বাসৎ খাঁ ৬১
বিলাস খাঁ ৪৩
বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর ৭৮
বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ৭৬
বীণা ৭
বৃহদ্দেশী ১৩
বেণু ৭
বেসরা ১৪
বৈজু, নায়ক ৪৩
বৈজু বাওরা ২৫
বৈদিক যুগ ২
বৌদ্ধ যুগ ৯
ব্যঙ্কটমোখী, পণ্ডিত ৪৯
ভরত ১০
ভাবভট্ট, পণ্ডিত ৫০
ভিন্না ১৪
মতঙ্গ ১৩
মহম্মদ শা ৫০
মহাভারত ৮
মীরাবাঈ ৩০
যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদু ভট্ট) ৭২
যন্ত্রকোষ ৭৫

য়ুনিভার্সাল হিস্ট্রি অফ ম্যুজিক ৭৫
য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সংগীত ৮৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৯
রাগতরঙ্গিণী ২৬
রাগবিবোধ ৪৭
রাগরাগিণীর আদর্শ ৮৫
রাগ-সংজ্ঞা ৮৪
রাজা মান ও রানী মৃগনয়নী ২৮
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ৭৩
রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ৬৯
রামায়ণ ৮
লোচন, কবি ২৬
শার্ঙ্গদেব ১৮
শিল্পাদিকম্ ৯
শুদ্ধ রাগ ২৭
শুদ্ধা ১৪
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৭৪
শ্রীচৈতন্য, মহাপ্রভু ৩২
শ্রুতির সার্থকতা ৮৪
ষাড়ব ৫
ষাষ্ঠিক ১৪
সংকীর্ণ ২৭
সংগীতদর্পণ ৪৭
সংগীতপারিজাত ৪৮
সংগীতমকরন্দ ১৫
সংগীতরত্নাকর ১৯
সংগীতসময়সার ১৫
সংগীতসার ৭০
সদ্‌রাগচন্দ্রোদয় ৪২
সদারঙ্গ, শাহ্ (নিয়ামৎ খাঁ) ৫০
সম্পূর্ণ ৫
সাধারণী ১৪
সামগান ৩
সাম বেদ ৩
সামিক ৫
সালংক রাগ ২৭
সুরসাগর ৩২
সুলতান হুসেন শর্কী ২৭
সেতার ২৩
সোমনাথ ৪৭
সংগীতজ্ঞগণের শ্রেণীভেদ ৫৩
স্তৌভিক ২
স্বরান্তর ৫
স্বরিত ৫
হরিদাস, স্বামী ৩৩
হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ৭৭
হ্রস্ব ৬